স্বার, নিয়ন্ত্রিত বিধি-নিষেধই মানবকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে সমর্থ। বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া, অথবা উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বিচার-পরায়ণ না হইয়া, স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে, সেই স্বাধীনতা-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া যাহারা সংসার-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে বাসনা করেন, তাহাদিগকে ঘোর ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই ভ্রান্তি মানবের উৎকর্ষ সাধন-পথের কণ্টক-স্বরূপ। অনেকে বলিয়া থাকেন "বিধি নিষেধের বন্ধন মানব মনের স্বাধীন বৃত্তি-নিচয় সঙ্কুচিত করিয়া মানবের ক্রিয়া ও স্বেচ্ছাশক্তি ধ্বংস করতঃ পুরুষকারকে পঙ্গু করিয়া তোলে। একঘেয়ে বিধি-নিষেধ মানবের সুখ ও শান্তি পথের আবর্জ্জনা মাত্র।" প্রত্যেক দেশের এবং জাতির মধ্যে প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধ কদাচ দোষাবহ বলা যাইতে পারে না। এমন কি অতি বর্ব্বরদিগের মধ্যে প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলিও যে তাহাদের অভীষ্ট সাধক এবং প্রকৃতির অনুকূল এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কোন মানবই স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তিশূন্য নহে, তত্রাচ দেখিতে পাওয়া যায় আশ্রয় শূন্য হইয়া মানব কোন কর্ম্ম করিতে পারেনা বা চাহে না। মানব কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গেলে একটী অবলম্বন অন্বেষণ করে, ইহা যেন স্বাভাবিক। এই অবলম্বনকেই বিধি-নিষেধ বলা যাইতে পারে। স্বেচ্ছা বা ক্রিয়া শক্তি ও স্বাধীনতা মানবের স্বভাবজাত। কিন্তু, একদিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে, একটী অবলম্বন বা বিধি-নিষেধের বশীভূত হইয়া না করিলে কদাচ তাহা ঈপ্সিত ফল প্রদানে সমর্থ হয় না। কেবল মাত্র স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় কার্য্য করিতে গিয়া অধিকাংশ সময়ে যে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে, এরূপ দৃষ্টান্ত এ জগতে বিরল নহে। এবং এই অনর্থ কেবলমাত্র কর্ম্মকর্ত্তাকে নহে, সমগ্র মানব-সমাজকে ভোগ করিতে হয়। এইরূপে সমাজ-বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়া সমাজে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। দেশ-ভেদে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব যেমন প্রভেদ, মানবীয় প্রকৃতিও তদ্রূপ প্রভেদ সুতরাং বিধি-নিষেধ আচার-ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। কোনও দেশের আচার-ব্যবহার, বিধি-নিষেধ অর্ব্বাচীন নহে, অতি প্রাচীন, এবং তদ্দেশবাসিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণপ্রদ। সেইজন্য সহজে প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিধি-নিষেধ কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। যখনই এই প্রাচীন বিধি-নিষেধাদির উপর হস্তপেক্ষ হইবার উপক্রম হয়, তখনই বিষম বিপ্লব সংঘটিত হইয়া নর-শোণিতে ধরা প্লাবিত হয়। জগতের ইতিহাসে সে প্রমাণের অভাব নাই।

অধিকাংশ মানবের জীবনটাই একঘেয়ে। আহার, নিদ্রা, ভয়, এবং মৈথুন, এই চারি প্রকার ব্যাপারের অনুষ্ঠানে, আয়োজনে, এবং ভোগে মানবের দিন যাইতেছে। এই একঘেয়ে ব্যাপারে মানবের আসক্তিও অত্যধিক। [illegible] আসক্তির মাত্রা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, [illegible] বৃত্তিগুলি যতই ক্রোধ-লোভের দিকে ধাবিত [illegible]

ততই সংযম ক্রমে ক্রমে অনায়ত্ত হইয়া উঠে, তখন অবাধে স্বেচ্ছামত সুখ-ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা মানবকে উন্মত্ত ও পশুবৎ করিয়া তুলে, তখন বিধি-নিষেধগুলি একঘেয়ে আপদ-বালাই, সুখের পথের কণ্টক-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, এবং এই আপদ-বালাই, ও কণ্টক দূর করিবার জন্য আপনার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু পারে না : সহস্র চেষ্টাতেও এ আপদবালাই, এ কণ্টক দূর কবিতে সহজে পারে না। শৈশব হইতে যাহা অভ্যস্ত হইয়াছে, দেশ ও জাতির মধ্যে যাহা বদ্ধমূল, তাহা সহজে দূর করা কঠিন। এখন, হে মানব! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এই বিধি-নিষেধ তোমাকে কি ভীষণ অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। তোমার উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি যখনই বিপথগামী হইবার উন্মুখীন হইতেছে, তখনই তোমার দেশীয় ও জাতীয় বিধি-নিষেধ লাগামের ন্যায় তোমার মুখ ফিরাইয়া দিয়া চিত্তবৃত্তিগুলি বিভিন্নমুখীন করিয়া দিতেছে। আরও বিবেচনা কর, তোমার দেশীয় ও জাতীয় অর্থাৎ ভারতের আর্য্যজাতির বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তক কাহারা। ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ। সেই মহাজনগণ ধ্যাননেত্রে, জ্ঞানচক্ষে যাহা স্বদেশ ও স্বজাতির উৎকর্ষ-সাধক উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধের সম্যক অনুগামী হইলে পুরুষকারকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে, চিত্তবৃত্তি ধর্ম্মময় হইয়া উঠিবে, পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিয়া দেবতুল্য হইবে।

আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় প্রভৃতি কার্য্য মনুষ্য ও পশু উভয়েরই সমান। তবে পশু অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ কেন? মানবে এমন কি এক পদার্থ আছে, যাহা পশুতে নাই এবং যাহা হইতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব? ধর্ম্ম—ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিতেছে। এই ধর্ম্মোপার্জ্জনই আর্য্যজাতির জীবনের লক্ষ্য। আহার, নিদ্রাদি বৃত্তিগুলি মানবের স্বভাবজাত। সুতরাং মানব এগুলি সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু এগুলির যদি অপব্যবহার হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে পারে। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষণা মারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের প্রধান উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য। দ্বিতীয়তঃ কামক্রোধাদি রিপুগুলি দুর্দ্দমনীয় হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির ধ্বংস সাধন করিতে পারে। সেইজন্য আর্য্য-ঋষিগণ, আর্য্য-জাতির জন্মমুহূর্ত্ত হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম বিধি-নিষেধের আয়ত্তাধীন করিয়া গিয়াছেন। অতএব গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিহিত যাবতীয় কর্ম্ম অবিচারিত চিত্তে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে আর্য্য-জাতির অবশ্য প্রতিপালনীয়। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের একমাত্র উপায়।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং সম্যঙনিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্ম মূলং নিষেবেত সদাচার মতন্দ্রিতঃ॥

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতা প্রজাঃ।
আচারাদ্ধর্ম্ম মক্ষয্যমাচারো হন্ত লক্ষণম্ ॥
দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ ॥
সর্ব্ব লক্ষণ হীনোঽপি যঃ সদাচারবান নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসুয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবিত ॥

মনু, ৪র্থ অঃ ১৫৫-৫৮।

বেদ এবং স্মৃতিতে সম্যক উক্ত, স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত,সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল স্বরূপ সাধুজনাচরিত আচার সকল নিরুপণ হইয়া যত্নের সহিত পালন করিবে। সদাচারবান হইলে দীর্ঘায়ু মনোমত সন্তান সন্ততি ও অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং সহজাত কোন অলক্ষণ থাকিলে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। দুরাচার পুরুষেরা জন-সমাজে সতত নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। কুলরেখাদি সর্ব্ব প্রকার শুভলক্ষণহীন হইলেও যেজন সদাচারবান্, শ্রদ্ধাবান, এবং পরের মর্য্যাদা রক্ষক তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন।

হায়! কালপ্রভাবে আর্য্যজাতির এই সনাতন বিধি-নিষেধ আজ হতাহত ও উপেক্ষীত হইয়া পদদলিত হইতেছে। এই বিধি ও নিষেধের প্রভাবে আর্য্য জাতি একদিন ঐহিক ও পারত্রিক চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগতপূজ্য হইয়া জগদ্গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ—রুগ্নদেহ,ভগ্ন-স্বাস্থ্য, অল্প-আয়ু, অকাল-জরা, শোক-তাপে জর্জ্জরিভূত, দারিদ্র্যের কষাঘাত প্রপীড়িত। জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া পরানুকরণ পরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছাচারের প্লাবন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে।

ধর্ম্মার্জ্জন করিতে গেলে মনের নিগ্রহ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে সংসার বাসনারও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই মনের নিগ্রহ করা নিতান্ত দুরূহ। বলপূর্ব্বক মনকে কেহ নিগৃহীত করিতে পারেন নাই। মনোবৃত্তির আনুগত্য স্বীকার করিয়া মনকে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে হইবে। মনোবৃত্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে গিয়া পাছে আবার বিষয় সংসর্গে চিত্তের যাবতীয় অসৎ বৃত্তিগুলি উন্মেষিত হইয়া উঠে,এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধের অনুগামী হইয়া মনোবৃত্তি পরিচালিত করিতে পারিলে মনচ্যুতির আশঙ্কা বিদুরিত হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

ধার্য্যমানং মনোযর্হি ভ্রাম্যদাশ্ব নবস্থিতং।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশংনয়েৎ।

এই প্রকারে আমাতে মনের ধারণা করিবার কালে, যদি চাঞ্চল্য নিবন্ধন চিত্ত বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হইয়া প্রতিষ্ঠাচ্যুত হয়, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার নিরোধার্থ অগ্রসর না হইয়া কথঞ্চিৎ ভোগার্থ প্রশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য; এবং অতি সাবধানে মনের অনুকূল পথে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া ক্রমশঃ নিজের মনকে বশীভূত করাই যুক্তিসঙ্গত।

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতো প্রাণো
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ॥

কিন্তু মনের নিরোধ-কার্য্যে [illegible]

উপেক্ষা করা না হয়। সর্ব্বদা প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে সাত্বিক-বুদ্ধিবলে মন বশীভূত করাই বিবেকীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এষবৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্নদাস্তস্যার্ব্বতো মুহুঃ॥

ভাগবত ১১শ স্বন্দ ২০ অঃ ১৯-২১।

একটী অদমনীয় অশ্বকে বশীভূত করাইতে হইলে অশ্বচালক কথনও বলপূর্ব্বক অশ্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে না। অশ্বের ইচ্ছানুরূপ গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিপ্রায়ের অনুকরণে ভ্রমণ, ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় প্রণালীসমূহে অশ্বকে শিক্ষিত করাইয়া লয়। সেইরূপ মনোবৃত্তির অনুকরণেই মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে তাহার নিয়মন নিতান্তই অসম্ভব। কারণ. মনের নিরোধ নিতান্ত দুরূহ। শাস্ত্রকারগণ মনোনিবৃত্তিকেই পরম যোগ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই শাস্ত্রবাক্যগুলির দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, মানবীয় চিত্তবৃত্তি সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে; এবং হঠাৎ নিবৃত্তি করাও উচিত নহে, সংযত হইয়া ভোগ করাই উচিত। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, এইগুলি মানবের চিত্তবৃত্তি; মানবচিত্তই ইহাদের আধার এবং এইগুলি লইয়াই মানবের সংসার। এই সংসারে ভোগল্যালসার প্রতি অত্যাশক্তিই মানবের বন্ধন ও অশেষ দুর্গতির কারণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হিতর্ষা শিশ্নোঽন্য-
তস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্বচ কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ
সপত্ন্যইব গেহপতিং লুনন্তি॥

(ভাগবত ১১-৯ অঃ ২৭, ২৯)

দেহাভিমানী জীবের নিগ্রহের সীমা নাই। বহু পত্নী বিশিষ্ট স্বামীকে যেমন সম্ভোগার্থ প্রত্যেক বনিতা তাহার এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করতঃ স্বামীকে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, পুরুষেরও প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তাহার অনভিপ্রায়ে স্ব স্ব বিষয়াভিমুখে দেহাভিমানী মানবকে আকর্ষণ করতঃ নিতান্ত বিপন্ন করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জিহ্বা রসের প্রতি, তৃষ্ণা জলে, শিশ্ন ব্যবায়ে, ত্বক স্পর্শে, উদর অন্নে, শ্রবণ শব্দে, ঘ্রাণ গন্ধে, চঞ্চলনয়ন রূপে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ কার্য্যে অনবরত নিয়োজিত করিয়া জীবকে বিমূঢ় করিয়া ফেলে।

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদ-
মনিত্যমপীহধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়
বিষয়ঃ খলুসর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

বহুজন্মের পর সকল পুরুষার্থের সাধনভূত অথচ অনিত্য এই দুর্লভ মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া রোগাদি দ্বারা বিপন্ন হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়া মোক্ষের জন্য যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ মৃত্যু সততই এই দেহের অনুসরণ করিতেছে, বিষয় সম্ভোগার্থ ক্ষণকালও অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু বিষয়-সম্ভোগ কোন যোনিতে দুর্লভ নহে। অতি নিকৃষ্ট শূকরাদি যোনিতেও তদোচিত ভোগ্য পদার্থের অভাব নাই।

অতএব এই সংসারে অবশ্য উপভোগ্য বিষয়গুলি যথাসম্ভব ও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অনুগামী হইয়া ভোগ করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এই বিধিনিষেধ কি? ভগবান বলিলেন—"অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, আসক্তি, হ্রীঃ, অপরিগ্রহ, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, সত্যসংকল্পতা, ক্ষমা ও অভয় এই দ্বাদশটীর নাম যম। আর শৌচ, মন্ত্রজপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ঈশ্বর-প্রণিধান, তীর্থসেবা পরোপকার, সন্তোষ এবং আচার্য্য শুশ্রূষা এই দ্বাদশটী নিয়ম নামে অভিহিত। হে প্রিয় উদ্ধব! এই কয়েকটী যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সাধক যাহা অভিলাষ করিবেন, সেই সকল ফলই লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদ্ধব কহিলেন—"হে হৃষীকেশ! সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ আপনার আজ্ঞাই বিধিনিষেধরূপ বেদ এবং এই বেদই কর্ম্মসমূহের গুণ ও দোষ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বর্ণভেদ, আশ্রমভেদ, প্রতিলোমজ বা অনুলোমজ মানবগণের দোষ ও গুণ, দ্রব্য, দেশ, কাল, বয়ঃ, স্বর্গ ও নরকের দোষাদোষ সমস্তই আপনার আজ্ঞারূপ বেদই প্রতিপাদন করিতেছেন।" সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ সবই সনাতন।

এই সনাতন বিধিনিষেধ—যম ও নিয়মাদি কিরূপভাবে অভ্যাস করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, আমরা অতি সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিলাম।

যোগীন্দ্রগণ বলিলেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহিতত্রচোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

ভাগবত ১১শ অঃ ৫।

হে রাজেন্দ্র! স্ত্রী-সম্ভোগ, আমিষভোজন ও মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু আসক্তি বশতঃ যথেচ্ছাচারের বিধি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিবাহের দ্বারা পত্নী-সম্ভোগ, যজ্ঞে আমিষ ভোজন ও সৌত্রামণি প্রভৃতি যাগে মদ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিতান্ত আসক্তিশীল পুরুষের পক্ষে নিয়মবিধানে নিবৃত্তিরই বিধান করিয়াছেন। স্ত্রী-সম্ভোগ, মদ্য-মাংস ভোজন জীবের স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম; এবং এই তিনটী বিষয়ের দ্বারা সৃষ্টিমর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে। কিন্তু অনিয়মিত আচরণে সৃষ্টির মর্য্যাদার ত্রুটীও যথেষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথাপশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥"

যজ্ঞে যে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পান না করিয়া ঘ্রাণ লইলেও বিহিত পানের সিদ্ধি হয়। দেবতার উদ্দেশে পশু-হননের ব্যবস্থায় হিংসাজনিত দোষ স্পর্শ না হইলেও অপর যে কোন কারণে বধ করিলে দোষ ঘটিবে। পুত্রোৎপাদন উদ্দেশ্য ব্যতীত কামত স্ত্রী-সম্ভোগ অবিধেয়। বিলাসী ব্যক্তি-

গণ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য অবধারণে সক্ষম না হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জানিতে পারে না।

শাস্ত্রে পত্নীগ্রহণ, মদ্য-মাংস ভোজনের ব্যবস্থা আছে বলিয়া যে, নিরন্তর তাহাতে আসক্ত থাকিতে হইবে এমন নহে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" পুত্রদত্ত পিণ্ডের দ্বারা জীবের পরকালে সদ্গতি হয়; সুতরাং পুত্রের জন্যই ভার্য্যাগ্রহণ আবশ্যক। যতদিন পুত্রের জন্ম না হয়, ততদিন পত্নীর পত্নীত্ব। পুত্রের জন্ম হইলে পর, পত্নী ধর্ম্মকার্য্যের সহকারিণী—সহধর্ম্মিণী মাত্র। আর পুত্র জনন অভিপ্রায়ে ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে কদাচ স্ত্রীগমন করিবে না, আবার অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বদিনেও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। দিবাভাগে স্ত্রী সহবাস নিষেধ, রাত্রিতে বিধেয়; তাহাতে আবার অতি রাত্রিতে নহে, পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে ঋতুস্নাতা পত্নী সন্নিধানে যে গমন না করে, তাহাকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।

শাস্ত্রে মাংস ভোজনের বিধি আছে বলিয়া মাংস ভোজনের অভিপ্রায়ে দেবকার্য্যাদি করা উচিত নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূতৈসর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্যের জন্য পশু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। অতএব যজ্ঞে যে পশু বধ, তাহা অবধ অর্থাৎ বধজন্য পাপ নাই।

অতএব যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস ভোজনই ব্যবস্থা। মাংস ভোজনের অভিপ্রায়ে যজ্ঞের ব্যবস্থা হয় নাই। তবে "ব্যাধি হেতু অথবা আহারাভাবে যদি প্রাণ যায় তাহা হইলে বৃথা মাংস ভোজন করিতে পারা যায়। শাস্ত্র এ কথাও বলিয়াছেন। এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে করিতে যম ও নিয়মাদিতে অভ্যস্ত হইয়া প্রকৃত মানব নামের যোগ্য হইবে। যথেচ্ছাচারই মানবকে মানবত্ব হইতে বিকৃত করে; আর্য্যঋষিগণ এই যথেচ্ছাচার নিবারণকল্পে যাবতীয় বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজকাল ভারতে স্বেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত বহিলেও বিধি-নিষেধের প্রভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। হইবেও না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দীনের ভিক্ষা।

ওগো, কোন্ স্বরগের পুণ্য মাখা,
আরাধনার ইষ্ট তুমি।
কলুষ কুটিল মর্ত্তে লয়ে
অভিশাপের জন্ম আমি।
আকুল অধীর উচ্ছ্বসিত,
ব্যাকুলতার গণ্ডী দিয়ে,
নিরাশ বিফল স্বার্থ ভরা,
ব্যর্থ পূজার অর্ঘ লয়ে—
কেমন করে তুচ্ছ অসার,
অভিমানের ভ্রান্ত বন্দ।
বাঁধবে তোমায় ইষ্ট আমার
করতে ব্রত উদ্‌যাপন॥

ক্ষুদ্র বড়ই জীর্ণ মলিন,
আত্ম-ত্যাগের যজ্ঞ মাঝে,
হেলায় দিতে ভগ্ন হৃদয়
পূর্ণাহুতির যোগ্যসাজে—
কাঙ্গাল দীনের শক্তি কোথা,
ভিক্ষা যে তার মাত্র পুঁজি।
যা' ছিল তা' অর্পি সকল
শূন্য যে মোর মর্ম্ম সাজি॥
আজি, তোমার দ্বারে দৈন্য অভাব,
জীবনব্যাপি গুপ্ত ব্যথা,
শ্রান্ত পরাণ-পূর্ণ হুতাশ
তীব্র জ্বালার মর্ম্ম গাথা,—
নয়ন জলে মন্দির তল,
দিবস-রাতি সিক্ত করি।
জানাচ্ছি তাই দাওগো দেখা,
এস হৃদয় পূর্ণ করি॥

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

কৃষি-শিক্ষা এবং বঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতি।

আমাদের বর্ত্তমান অবনতি দেখিয়া অনেকেই বিচলিত হইয়াছেন। কি উপায়ে আমাদের বর্ত্তমান জীবন সমস্যা বিদূরিত হইতে পারে তাহার জন্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাথা ঘামাইতেছেন। এসম্বন্ধে সুবিস্তার আলোচনা করিতে হইলে আমাদের কৃষির উন্নতি সর্ব্বাগ্রে যে করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিগুলি দেশমধ্যে প্রবর্ত্তন আবশ্যক, গো-রক্ষা, গো-বীমা, গো-চারণ-রচন, গো-পালন, সুলভ গোচিকিৎসা বিধি দেশে প্রবর্ত্তন আশু করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের গোকুলকে রক্ষা করিতে হইলে, বিশুদ্ধ দুগ্ধের দেশে প্রচুর সরবরাহ করিতে হইলে, স্থানে স্থানে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামের সমষ্টিতে গো বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আজকাল খুবই বেশী দৃষ্ট হইতেছে। গো-বীমা সম্বন্ধে বেলজী, ডেলিনিউস্, বিগত বৈশাখ মাসের হাওড়া হইতে প্রকাশিত আলোচনা পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আমি আমার দীন দেশবাসী লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে দেশের লোকের দৃষ্টি ও চিন্তা পড়িয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বিলাত, জার্ম্মেনী, ডেন্মার্ক, ওলন্দাজ দেশ, ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, আমেরিকা, রুশ প্রভৃতি সভ্য পাশ্চাত্য দেশে গোরক্ষণের জন্য গো-বীমা কোম্পানীর বহুল সৃষ্টি ও বাহুল্য দেখা যায়। আমরা বাক্যের জাতি,ব্যবহারিক কাজে আমরা বড় পশ্চাৎপদ। এখন আমাদের কাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, দেশের লোকের খাদ্য ও অন্নসঙ্কট দূর করিতে হইবে, তবেই আমাদের রক্ষা; নচেৎ আমাদের জাতির অচিরে অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে চারণের সুব্যবস্থার দ্বারা, মঙ্গল শুল্ক বিধি প্রশমিত করিয়া জননগাভীর মঙ্গল-সুবিধা গো-বীমা কোম্পানীর দেশে বহুল প্রচার করা

বিশেষ কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসিগণ শুষ্ক গাভীগণকে পুনশ্চ গর্ভিণী হওয়া পর্য্যন্ত গো-বীমা কোম্পানীর হস্তে দেন এবং সামান্য সামান্য মাসিক চাঁদা বা প্রিমিয়ম্‌ দেন। কোন কারণে যদি বীমাকৃত গাভীটি মৃত হয়, তবে গো-স্বামী শতকরা কতক হারে কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণও পাইয়া থাকেন, এবং গাভী যদি কোন দুর্ঘটনা না হইয়া গর্ভিণী হয়, তবে কোম্পানী পুনশ্চ গাভী গোস্বামীকে ফেরত দিতে বাধ্য হন। এইজন্য রেল বা জাহাজে নয়ন আইন, জনন গো-মেষাদির জন্য প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। তাহার ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশে বহুল আছে। জনন গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর নয়ন-শুল্ক পাশ্চাত্য দেশে স্বতন্ত্র ব্যবস্থিত আছে। জনন গো-মেষ অশ্বাদি গৃহপালিত পশুকে বিলাতের ইউনিয়ান ষ্টীম শিপ্‌ কোম্পানী বিনা শুল্কে বিলাত হইতে কেপ-কলোনিতে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। আমাদের মত বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে গবর্ণমেণ্টের এ নিয়ম অবশ্য প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এ সব দেশহিতকর ব্যাপারে দৃষ্টি পড়িবে না কি?

চারণাভাবেও দেশে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীহাসানন্দ বর্ম্মার স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণ গোশালার অনুসরণ দেশের লোকের বিশেষভাবে করা কর্ত্তব্য। সে দিন ডেলিনিউস্‌ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক তাঁহার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে সে সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ক্রটী করেন নাই। কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠ স্থান সমূহের সংকীর্ণ স্থানে দুগ্ধদাত্রী গোগণকে যেরূপ নির্দ্দয় ও নৃশংসভাবে রাখা হয়, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বঙ্গবাসী, বসুমতী, বেঙ্গলী, ডেলিনিউস প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণকে আমরা এ সব বিষয় বিশেষ যত্ন সহকারে প্রদর্শন করিয়াছি। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মহোদয়ও এইরূপ নির্দ্দয় ও নৃশংস ব্যবহারের বিষয় অপরিজ্ঞাত নহেন। যেহেতু তিনি গয়লাগণকে লাইসেন্স বিতরণ করেন। এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে রক্ষিত দুগ্ধদাত্রী গাভীগণ রোগের বীজাণু বর্দ্ধিত করিবে না ত কি? এ দিকে কি হেল্‌থ্‌ আফিসের দৃষ্টি পড়ে না? আশা করি, গোমনুষ্যের হিতকল্পে, কৃষির হিতকল্পে দেশের রাজা মহামান্য সহৃদয়চেতা লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের দৃষ্টি এ দিকে আশু পড়িতে ক্রটী হইবে না।

আসাম ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টদ্বয় দেশের পশুরক্ষণ জন্য প্রচুর চারণ মাঠ দিয়াছেন। ইহাতে কৃষককুলের দ্বারা মহান্‌ হিত সাধিত হইতেছে। তৃণবহুল মাঠে চরিয়া ধেনুগণ বিশেষভাবে তেজস্বর হইতেছে এবং তজ্জন্য কৃষকদের উৎকৃষ্টতরজাতীয় বলদপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এই বিধির আশু অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। ক্রেডিট-সোসাইটীর ভিত্তির উপর আমাদের দেশে বহুল গো-বীমা কোম্পনী পরিচালিত করিতে না পারিলে, দেশের দুগ্ধ ও গোরক্ষার পথ কদাচ উন্মুক্ত হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোশালা, গোপরিচর্য্যাদি আমাদের

দেশের কৃষককুলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তক স্কুল ও কলেজে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

গো-বীমা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় করিয়াছি। তাহার পুনরুক্তি অত্র স্থানে নিষ্প্রয়োজন। এখন গোচারণ সম্বন্ধে ২। ১ কথা বলিব।

গো-রক্ষা এবং গো-জাতির উন্নতি বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে হইলে সকল স্থানে গো-চারণ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গো-চারণের অস্তিত্ব আমাদের দেশে প্রাচীন কালাবধি থাকিলেও আজকাল অর্থলোলুপ জমীদারগণ সেইগুলিকে প্রজাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা খুবই অর্থবান হইতেছেন। কিন্তু এটা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। তাহার কয়েকটি কারণ পরে বিবৃত করিব। আগে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে, জমীদারগণ কিসের বলে, এবং কি কারণে অবাধে প্রজার সহিত, দেশের ভবিষ্যৎ ও নিজেদের ভবিষ্যৎ লাভালাভ সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া এই সকল পতিত জমীগুলির বন্দোবস্ত করেন। আমাদের বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোটানাগপুর দেশে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণাওয়ালিশের শাসনকাল হইতে দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে। এই স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে দেশের জমীদারগণ সরকার হইতে যাবতীয় ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত লইয়াছেন। এই বন্দোবস্তের সর্ত্তের মতে সরকার কোন স্থানেই নিজ হক্ বা দাবী সীমাবদ্ধ করেন নাই, অথবা জমীদারও তাহাদের অধীনে প্রজাবর্গের হিতার্থে ভবিষ্যতে কোন হিতকর আইন বিধিবদ্ধ করিবার হক্ ত্যাগ করেন নাই। যাবতীয় পতিত জমী উঠ্‌তি করিবার অথবা দেশের গোবৃন্দকে চারণভূমি হইতে বঞ্চিত করিবার হক্ কোন জমীদারকে দেন নাই এবং ঐরূপ মর্ম্মে কোনরূপ বন্দোবস্তের চুক্তি হয় নাই, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। জমীদারগণ কর্ত্তৃক যে চারণ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আজিকাল শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য হইলে ভূস্বামিবর্গের ক্রিয়া-কলাপ এ সম্বন্ধে বস্তুতই সম্পূর্ণ আইনাবরুদ্ধ এবং অবৈধ। সম্পূর্ণ বিলাতীধরণে দেশহিতকর ব্যাপার না আসিলে আমাদের অভিপ্রেত, মনোমত এবং আদরণীয় হয় না। বিলাত গো-খাদকের দেশ; কিন্তু ঐ দেশেও দুগ্ধবতী গাভী হত্যা করিবার কোনরূপ নিয়ম নাই এবং কেহ প্রভূত অর্থ পাইলেও কদাচ তাহা করে না। কিন্তু আমাদের দেশের হিন্দু গোয়ালাগণ কশাইয়ের নিকট বৎস বিক্রয় করে, গাভীকে ফুঁকা দেয়, বৃদ্ধ হইলে দারিদ্রের দায়ে খাওয়াইতে না পারিয়া চারণাভাবে শেষে নির্ম্মম হইয়া তাহাদিগকে কশাইহস্তে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক জাতীয় কালিমা কি হইতে পারে?

বিলাতে গো-চারণের ব্যবস্থা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে স্মিথ্ বা সেলুসবরির পুস্তক পাঠ করিলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ [illegible] যাইতে পারে। রাজার, প্রজার, [illegible] ব্যবহার, প্রাচীন ও চির[illegible] [illegible]

পরের জমীতে গো-চারণের হকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরের জমীতে গো-চারণ, পরের খাল-বিলে মাছ ধরা, পরের জমী হইতে মাটী লওয়া, জঙ্গল হইতে কাঠ কাটা, পরের কাঠে লাঙ্গল প্রস্তুত করার হক্ প্রভৃতি প্রিস্ক্রুপটিভ্ হক্।

চারণ চারি প্রকারের :— ১এপেন্‌ডেট, এপারটনেণ্ট, ইন্‌গ্রোস, পার্‌কজাডার্ভিসিনেজ্।

এমন অনেক স্থানে দেখা যায় যে, একগ্রামের প্রজা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরের জমীতে গাভী চরাইয়া থাকে। এই অধিকার প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রাচীন "কাষ্টমের" দ্বারা লব্ধ হয়। কৃষি ও কৃষীবলের রক্ষার জন্য এই অধিকার লাভ করা যায় এবং সে জন্য এই অধিকারের অস্তিত্ব রিচার্ডের রাজত্বকালের পূর্ব্বে প্রমাণ করান আবশ্যক। এই হক্ বলদ, বৃষ, মেষ, অশ্ব, যাহারা ভূমি উর্ব্বরা করে বা চাষ করে, তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য। ছাগল, শূকর হাঁস, মুর্গী, পেরু প্রভৃতির পক্ষে এই সত্ব প্রযোজ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি জমীদারের গ্রাম্য প্রজার অধিকার। তাহারা চাষের জন্য যে পশু-পালন করে, তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন জন্য জমীদারের জমীর উপর চরাইবে। জমীদার ইহা বারণ করিতে পারেন না। আমাদের দেশের জমীদারগণ চারণগুলির বন্দোবস্ত করিয়া প্রজাদের এই প্রাচীন হক্ এবং দাবীর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এই অধিকার বহুকালের অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারে (Prscription) লব্ধ হয়। চারণাধিকার এপেণ্ডেন্ট প্রাচীন উক্তি জমীর সহিতই সংযোজ্য। এই অধিকারটী স্থানীয়। এপারটুনেণ্ট বা চারণ বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির ভূমি বা জঙ্গলে পশু চরাইতে পারে। ইহা গ্রাণ্টের বা অনুমতির দ্বারা লব্ধ হয়। এই অধিকার গৃহপালিত পশু এবং পক্ষী সম্বন্ধে অনুমতির দ্বারা লব্ধ হইতে পারে। দানের বা অধীকারের দলীলের অপ্রাপ্তিতে বহুকালের ব্যবহারে (Pescription) এই অধিকার সাব্যস্ত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে স্মিথ্ বনাম ফেভারেল, এবং মলি বনাম ক্লিফোর্ডের নজীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন নজীরও আছে।

কমন্ অব্ পাশ্চার ইন্ গ্রোসটী তৃতীয় প্রকারের চারণের অধিকার। ইহা কোনরূপ জমীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ম্যানর বা জমীদারীর বহিস্থ প্রজা দলীল বা প্রিস্‌ক্রুপ্‌-সন্ দ্বারা এই হক্ পাইতে পারে। চতুর্থ প্রকারের চারণ অধিকারটিকে "বাই ভিসিনেজ" বলিয়া অধ্যাপকগণ গণনা করিয়াছেন। যেমন এক গ্রামের প্রজারা তাহাদের চাষের গো, বলদ, মহিষ অপর গ্রামের বনে লইয়া গিয়া চরাইবার অধিকার বহু কাল ও অস্মরণীয় কাল হইতে ভোগ করায় তাহা আইনমত ভোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ উদাহরণ আমাদের বাঙ্গালা দেশমধ্যে, বিশেষতঃ বীরভূম, মেদিনী-পুর প্রভৃতি বনাকীর্ণ জেলা সমূহে এবং গয়া জেলায় গয়া, পালামৌ, সিংহভূম, মানভূম প্রভৃতি বেহার প্রদেশস্থ জেলাসমূহে দেখা গিয়া থাকে। অনেক সময় অত্যাচারী জমীদারগণ এক গ্রামের গো-বৃন্দকে গাছত বা চারণ জঙ্গল

হইতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া অর্থ আদায় করেন বা নিঃস্ব প্রজাদের উপর প্রাচীন ঝাল ঝাড়েন বা তাহাদের উপর পুরাতন পোষিত মনোমালিন্যের বদ্‌লা তুলিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করেন। প্রজাগণ যদি এই সব স্থলে চারণের হক্ দাবী করে, তাহারা দণ্ডের পরিবর্ত্তে নিজেদের দাবী আদালত-সমক্ষে সাব্যস্ত করিয়া ঐরূপ অত্যাচারী জমীদারবর্গকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সে অধ্যবসায় নাই, সে চেষ্টা নাই। আমরা নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি না। কাজেই আমরা সব দিকেই প্রপীড়িত, নিগৃহীত এবং পদদলিত হইয়া থাকি।

চতুর্থ প্রকারের চারণ অধিকার পাশাপাশি পতিত জমি বা ধন সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়। ইহা প্রাচীন প্রথা (custome) দ্বারা লব্ধ হয় না, বরং প্রাচীন ও অবিচ্ছিন্ন বহুকালের ব্যবহারের (procription) উপর নির্ভর করে। প্রিচার্ড বনাম পাওয়েল, জোন্‌স্ বনাম রবিস, ক্লার্ক বনাম টিঙ্কার এই হকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নজীর বলিয়া বিলাতী ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, পথিকগণ অপরের গ্রাম বা ক্ষেতের উপর দিয়া গিয়া পায়ের-দাগের মত চলাচলের রাস্তা করিয়া ফেলে। ইহা কাহারও আটকাইবার ও বেড়া দিয়া বন্ধ করার হক্ নাই। আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে এরূপ "মেঠো রাস্তা" অনেক দেখা যায়। এই সব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 'ল' পাশ্চাত্য দেশে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এইগুলির কোনরূপ নিবারক বিধি নাই এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না বলিয়া বোধ হয়, তাহা প্রচলিত নাই। কিন্তু চারণগুলি অর্থলোলুপ জমীদারগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে এবং ভারতীয় গো-বৃন্দের চারণের বহুরূপ কষ্ট হইতেছে বলিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন হওয়ায় ইহার অনুশীলন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করিলাম।

বিলাতী আইনের সামান্য আভাস উপরে দিলাম। এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে চারণ-আইন কতদূর প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে বড় রাজায় প্রজায় ঝগড়া হয় নাই; কিন্তু এখন জমীদারগণ গো-বৃন্দকে ভগবান-দত্ত আহারীয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া দু' একটি মোকদ্দমা রাজ দরবারে দেখা যাইতেছে। ১৮ উইক্‌লি নোট্ ৭৩৬ পৃ, ৩১ কলিকাতা ৫০৩, ১৩ কলি ২১৩, ৯ কলি ৬৯৮ ———প্রভৃতি নজীরগুলি অস্মদ্দেশে এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধ। গো-হনন সম্বন্ধে জজ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিষ্পত্ত্য আইন গো-সেবক ও রক্ষকগণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নজীর বলিয়া গণ্য হইবে।

পাঠক! বিলাত এবং ভারতে গোরক্ষা ও গোচারণ সম্বন্ধে কি পার্থক্য—ইহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আজকাল মান্দ্রাজ প্রদেশের প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ গোবংশের উন্নতিসাধন জন্য কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ষণ্ড দান করিয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল।

রাজা নীলাম্বর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির অবতারণা।

সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা এই সব বিষয় স্থির করিতে বসিলেন। অবশেষে স্থির হইল, উভয় রাজা এক তাঁবুতে উপস্থিত হইবেন, এবং সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

অদ্য মধ্যাহ্নে দুই রাজা একত্র হইবেন, অতএব বস্ত্রাবাস সুন্দর করিয়া সজ্জিত হইয়াছে, নানারূপ পত্র ও ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। সুবর্ণ-কলসী, কিংখাপের পতাকা, ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। এই স্থানটী সহরের মধ্যে, গৌড়েশ্বর মাত্র একশত অঙ্গরক্ষক সঙ্গে লইয়া তথায় আসিবেন, রাজা নীলাম্বরও তদ্রূপ সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আসিবেন। বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সমস্ত প্রহরীগণ অস্ত্র উত্তোলন করিল, রাজা নীলাম্বর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই গৌড়েশ্বর একাকী তথায় আসিলেন, সঙ্গীয় সৈন্যগণ বস্ত্রাবাসের বাহিরে থাকিল। উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন। গৌড়েশ্বর বলিলেন—"আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে হিন্দুদের আদর্শ রাজার আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হ'লেম। অনেক দিন থেকে আমার যে অভিলাষ ছিল, তাহা আজ খোদার ইচ্ছায় পূর্ণ হ'ল।" রাজা নীলাম্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন —"গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়, আজ আমার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন। আপনার যশ ও নাম যথেষ্ট শুনেছি, এখনও তাহাই দেখছি। যুদ্ধে জয় পরজয় কিছুই নয়, লোকের ভদ্র-ব্যবহারই চিরদিন থাকে। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাক্‌লেম।" বাদশাহ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"নিজগুণে যাহা বলেন, তাহাই শোভা পায়। আপনার ন্যায় রাজা আমি কম দেখেছি। এমন তেজস্বী বীর সত্যপ্রিয় প্রজাবৎসল নৃপতি ভারতে খুব কম। আপনাকে এতদিন জানি নাই, তাই পরের কথায় যুদ্ধের জন্য এসেছিলেম। এখন আপনার গুণে এতদুর মুগ্ধ হ'য়েছি যে, আপনার সঙ্গে বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হ'তে পার্‌লে জীবন সার্থক মনে করি। আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, এই রংপুর আমার বন্ধু-রাজ্য। চিরদিন আপনার বিপদে আমার বিপদ, আপনার সম্পদে আমার সম্পদ। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হ'ক, আমি নিজ রাজ্যে চ'লে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করুন, চিরদিন এ বন্ধুকে স্মরণ রাখবেন।" রাজা নীলাম্বর গৌড়েশ্বরের কথায় মোহিত হইলেন, এমন উন্নতমনা, দয়ালুপ্রকৃতির রাজা তিনি আর দেখেন নাই। রাজা নীলাম্বর মনে করিলেন—বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেম। অতএব আর কোন চিন্তার কারণ নাই। তিনি বলিলেন—"বাদশাহ! আপনি বঙ্গদেশের রাজা, আমি সামান্য প্রদেশের রাজা মাত্র, আমি আপনার প্রজাতুল্য। আপনার বন্ধুত্বভাবে আবদ্ধ হওয়া আমি নিজকে শ্লাঘ্য মনে করি। আশাকরি, আপনি কখনও আমাদের এ ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয় ভুল্‌বেন না। আমি,

রাজ্য,আমার প্রজাবর্গ, সব আপনারই অধীন।" গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আপনার বিনয়ে বড়ই সুখী হ'লেম। আপনি যথার্থই হিন্দু-কুলের আদর্শ। আপনি সকলের পূজনীয়, আপনি আমাদের সম্মানের পাত্র। আশাকরি, একদিন আপনার পদার্পণে গৌড়নগর ধন্য হইবে। আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে চল্‌লেম।" এই বলিয়া বাদশাহ বহুমূল্য কয়েকখানি রত্ন উপহার-স্বরূপ রাজাকে অর্পণ করিলেন, রাজাও হীরক-খচিত নিজ কণ্ঠহার বাদশাহের গলদেশে অর্পণ করিলেন। নানারূপ আলাপের পর বাদশাহ বলিলেন—"তবে এখন বিদায় হই, আগামী কল্য আমরা এখান থেকে চ'লে যাবো। তবে আমার বেগম সাহেবার একটা বড় অভিলাষ—তাহা বোধ হয় পূর্ণ হওয়ার উপায় নাই।" রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন —"বেগম সাহেবা কি সঙ্গে আছেন? এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এলেন না কেন? তিনি অনায়াসে রাণীর সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন।" বাদশাহের চক্ষু দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি রাজাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— আমি যথার্থ বন্ধু পেয়েছি। বেগম সাহেব এই রাজ্য কখনও দেখেন নাই, তাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন। তিনি হিন্দু রাজাদের অন্তঃপুর কখনও দেখেন নাই, রাণীর এত যশ শুনেছেন যে, একবার তাঁহার সঙ্গে আলাপ করতে বড়ই ইচ্ছুক। রাণী মলয়াবতীর নাম না জানে এমন লোক বঙ্গদেশে নাই। এমন সৎ-স্বভাববিশিষ্টা, সৎগুণের আধারভূতা, বরাঙ্গনা ললাম ভূতা, স্ত্রীলোক বড় বিরল। ইনি দেবী, তাই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেগম সাহেবা এতদূর এসেছেন।" রাজা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন —"তিনি তবে আগামী কল্য প্রাতে আমার অন্তঃপুরে যাবেন,ইহাতে আর বাধা কি আছে? ইহাতে বন্ধুত্ব আরও বৃদ্ধি হবে। আপনি বেগম সাহেবাকে আমার সেলাম জানাবেন ও রাণীর পক্ষ হইতে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ কচ্ছি।" বাদশাহ আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আমি অবশ্যই বেগম সাহেবাকে সব বল্‌বো। তিনি কাল ভোরে সঙ্গীদিগকে নিয়ে দোলায় করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করবেন, আপনি তদ্রূপ আদেশ প্রচার করবেন। তিনি রাণীর জন্য একটি বহুমূল্য পান্না ও হীরক-খচিত হার সঙ্গে আনিয়াছেন। সেটি তিনি স্বয়ং রাণীর গলদেশে পরাইবেন এই তাঁহার সাধ। যাহ'ক, এখন আমি বিদায় হই। ভাই! কাল দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে আবার যেন সাক্ষাৎ হয়।" এই বলিয়া বাদশাহ পুনরায় রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন,রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন, তারপর নিজ সৈন্যসহ প্রাসাদের অভিমুখে চলিলেন। বেগম সাহেবার জন্য প্রসাদ সাজাইতে হইবে, অন্তঃপুরে নানারূপ আহারের উদ্যোগ করিতে হইবে, অতএব রাণীকে অবিলম্বে এই সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অপরাপর সকলের সহিত বিনয়-নম্র-বচনে সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা ।

প্রাতঃকাল হইতে অসংখ্য দোলা রাজবাটী অভিমুখে চলিয়াছে। বেগম সাহেবা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাঁদিদের সহ চলিয়াছেন। সহরের দ্বার খোলা হইয়াছে, দ্বারে সমগ্র প্রহরী দণ্ডায়মান। তাহারা রাজাদেশে সসম্মানে দোলা ছাড়িয়া দিয়াছে। দোলার সঙ্গে অন্য প্রহরী নাই। বাদশাহ সাহেব প্রাচীরের বাহিরে সৈন্যসহ অপেক্ষা করিতেছেন। মন্ত্রী শচীপাত্র বাদশাহের নিকটেই আছেন।

সহর সজ্জিত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষ, তাহাতে নানাবর্ণের পতাকা উড়িতেছে। বারিপূর্ণ ঘট ও নারিকেল প্রত্যেক স্থানে শোভা পাইতেছে। রাজা রাণীর সম্মুখে পুষ্পমাল্য, নানারূপ পত্র, নানারঙ্গের পতাকা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। রাজা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই, অন্তঃপুরে রাণী সুসজ্জিত হইয়া দাসীদের সহ বেগম সাহেবার অপেক্ষা করিতেছেন। স্থানে স্থানে বাদ্য হইতেছে। অন্তঃপুরে দাসীরা কেহ বংশী বাজাইতেছে, কেহ সেতার বাজাইতেছে, কেহ গান করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দোলা ক্রমে রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী হইল, প্রহরীগণ সসম্মানে দোলার অভিবাদন করিল। রাজা আদেশ প্রচার করিয়া চলিয়া গেলেন, দোলাগুলি ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

রাণী অন্তঃপুরের দ্বারে সালঙ্কৃতা হইয়া দেবী প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ দোলা তাঁহার নিকট পৌঁছিল। সেই দোলাখানি কিংখাপের কাপড়ে আবৃত, নানারূপ কারুকার্য্য-খচিত, মুক্তার ঝালর চারিদিকে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দোলাতে বেগম সাহেবা আছেন মনে করিয়া রাণী অভ্যর্থনা করিলেন। দোলার বস্ত্র উঠিল, বেগম সাহেবার পরিবর্ত্তে মুসলমান সেনাপতি দোলা হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দোলা হইতে অস্ত্রধারী মুসলমান সৈন্য বাহির হইল। রাণী এই সব দেখিয়া চীৎকার করিয়া অচেতন হইলেন, মুসলমান সৈন্যেরা রাজবাটী আক্রমণ করিল। এমন সময়ে ভুবনেশ্বরী দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—"এস সেনাপতি, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস, রাজাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি।" সেনাপতি তৎক্ষণাৎ ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কতক সৈন্য চলিল। রাজা বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কত কি ভাবিতেছিলেন, বাহির হইতে যে ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছে, ইহা জানিতেও পারে নাই। এমন সময়ে হঠাৎ "আল্লা আল্লা হো" শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন, দেখিলেন, দ্বার বন্ধ, বাতায়নে দাঁড়াইলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল চীৎকার শুনিতে পাইলেন। এমন সময়ে কড় কড শব্দে শিকল খুলিয়া গেল, কতিপয় সৈন্যসহ সেনাপতি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাজার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না, তিনি তাড়াতাড়ি

কক্ষের মধ্যে যে সব অস্ত্র ঝুলান ছিল, তাহা হইতে একখানি অসি লইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"নরাধম! বিশ্বাসঘাতক! এই বুঝি বন্ধুত্ব! এর প্রতিফল দিচ্ছি।" মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল, তিনি একাকী ঐ পুরাতন অসির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে আর উপায় নাই, তখন একজনকে আঘাত করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী হইল। আর দুই তিন জন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল, অসির আঘাতে আর একজন পতিত হইল। তখন সেনাপতি বলিলেন—"ব্যাঘ্রকে জীবিতাবস্থায় ধরতে হবে।" এই সময়ে আরও কতকগুলি সৈন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজা একাকী কি করিবেন্? তিনি যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইতেছিলেন, তথাপি তিন চারিজন সৈন্যকে অসির আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করিল। হঠাৎ দূর হইতে একটি তীর আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল, অসিখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে মৃত্তিকায় পড়িল। অমনি সৈন্যেরা তাঁহাকে বন্দী করিল। তখনি তাঁহাকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইল।

এদিকে রাণীর চৈতন্য হইলে দেখিলেন, মুসলমান সৈন্যে রাজবাটি পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কতিপয় দাসী তাঁহার সুশ্রুষা করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজা কোথায়?" দাসীরা এই কথায় উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাণী বলিলেন—"বুঝেছি, তিনি হত হ'য়েছেন।" একজন দাসী বলিল—"না, তিনি বন্দী।"

গৌড়েশ্বর যখন বুঝিলেন—এতক্ষণ যোদ্ধাগুলি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তিনি সসৈন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজার সৈন্যদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। তিনি সসৈন্য রাজবাটী বাহির হইতে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে রাজধানী শত্রুকরতলগত হইল। রাজা বন্দী হইলে তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিলেন—"আপনি এখন আমার অতিথি, গৌড়নগরে চলুন।" রাজা রোষ-বিকম্পিত স্বরে বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতকের কথায় আমার এ দশা হ'ল। নর-পিশাচ! পাপীষ্ঠ! এর প্রতিফল পাবি। আমার একটা শেষ প্রার্থনা, একবার রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।" গৌড়েশ্বর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। রাজাকে সেই অবস্থায় রাণীর নিকট উপস্থিত করান হইল। রাজা জলদ্‌গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রাণি! এই শেষ দেখা। আমি বিদায় হ'তে এসেছি। যদি বীরপত্নী হও, যদি প্রকৃত সতী হও, তবে তদ্রূপ ব্যবহার করো। আর কি আশীর্ব্বাদ করবো। এজন্মে আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। সেই ভগবানের সক্ষাতে আবার মিলিত হব।" রাজার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রাণী বলিলেন—"স্বামিন্! প্রভো! এই শেষ দেখা হবে কেন? নিশ্চয় শীঘ্রই এরূপভাবে মিলিত হ'ব যে আর কেহ আমাদিগকে পৃথক করতে পারবে না। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল ঈশ্বর দিবেন। কার সাধ্য আমার গায় হস্তার্পণ করে। সিংহের স্ত্রী সিংহিনী হয়, আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র না। আমি শীঘ্রই সে বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিকট যাবো।"

রাজা আর কোন কথা না বলিয়া বিদায় হইলেন। এমন সময়ে ভুবনেশ্বরী "হি" "হি" করিয়া হাসিয়া উপস্থিত হইল। রাজার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিল—"এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।• তুমি আমার পিতৃরাজ্য নষ্ট করেছ, প্রজাসকল বিনষ্ট করেছ। তার প্রতিশোধ আজ হল। এইবার রাণী বিধবা হবে, আমি হাস্‌বো। জান্‌বে—আমার কৌশলে মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করেছে, আমার কৌশলে রাজবাটীতে প্রবেশ করেছে, আমার প্ররোচনায় শচীপাত্র গৌড়ে গিয়েছিল। আমার ঈঙ্গিতে তোমাকে গুলি করেছিল। আজ আমার আনন্দের দিন। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!" ভুবনেশ্বরী ভয়ানক হাস্য করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রাজাকে ঐ অবস্থায় বাহিরে আনা হইল, হংসেশ্বর ও হিন্দু সেনাপতি বন্দী অবস্থায় বাহিরে ছিলেন। সেই স্থানে আনিয়া রাজাকে একটি প্রকাণ্ড লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইল এবং বাহকগণ সহরের বাহিরে লইয়া চলিল। চারি দিকে হাহাকার উঠিল, প্রজারা ক্রন্দন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যের অত্যাচারে অগ্রসর হইতে পারিল না।

রাণী শয্যা হইতে উঠিলেন, মুসলমান সেনাপতি আসিয়া বলিলেন—"বাদশাহার আদেশ—আপনার গৌড়নগরে যেতে হবে, সেখানে বাদশাহের বেগম সাহেবা হবেন। আপনার ঐশ্বর্য্যের ও সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। দোলা বাহিরে আছে, আদেশ হলেই ভিতরে আনি।" রাণী ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন—"নর-পিশাচ! এতদূর স্পর্দ্ধা! সিংহিনীতে অভিলাষ। দূর হ।" এই বলিয়া বাতায়নে উঠিলেন, তারপর বলিলেন—"নরাধম! হিন্দু-রমণী কেমন ক'রে সতীত্ব রক্ষা করে দ্যাখ।" এই বলিয়া অবিলম্বে বাতায়ন হইতে নিম্নের জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করিলেন। মুসলমান সেনাপতি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব মুক্তি।

রাজা নীলাম্বরকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ষোলজন বাহক ও একশত সৈন্য প্রহরীরূপে গৌড়নগরে রওনা করা হইল। গৌড়েশ্বর রংপুর দখল করিলেন, কিন্তু শচীপাত্রকে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন না, একজন মুসলমান ওমরাহকে শাসনকর্ত্তার পদে রাখিলেন। শচীপাত্র বড় আশা করিয়াছিলেন যে, এবার বিশেষ পুরস্কার পাইবেন, এক্ষণে সে আশায় বঞ্চিত হইলেন, বরং তাঁহাকে রংপুর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল।

রাজাকে লইয়া সৈন্যগণ রওনা হইল। এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরী যুবকের বেশে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, গৌড়নগরে রাজার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহা দেখিয়া তাহার নিজান্ত

আনন্দ হইবে, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এইজন্য সে সাহ্লাদচিত্তে যাইতেছিল।

অদ্য ভীষণ অন্ধকার—রজনী দ্বিপ্রহর অতীত, বৃষ্টি পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও বহিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় বন, কোনস্থানে বা ঝোপ্। একটি বনের নিকটে ভগ্নমন্দিরে লৌহ-পিঞ্জর নামান হইল। রাত্রি অধিক হইয়াছে, অতএব একপার্শ্বে পিঞ্জর রাখিয়া সৈন্যগণ কিছু আহার করিয়া শয়ন করিল, কেবলমাত্র চারিজন প্রহরী জাগরিত থাকিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদেরও হঠাৎ নিদ্রাকর্ষণ হইল, বন্দীর পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই—অতএব প্রহরীগণ শয়ন করিল। একটি আলোক জ্বলিতে লাগিল। বন্দীর নিদ্রা নাই, এ অবস্থায় কাহারও নিদ্রার সম্ভাবনা থাকে না। রাজা একচিত্তে ভগবানের চরণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণের মমতা রাখেন না, কিন্তু এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইল। মৃদুস্বরে বলিলেন—"গুরুদেব! এমন অসময়ে দাসকে ফেলে কোথায় আছেন? দাসের বিষয় কি স্মরণ হয় না? আপনি ব'লেছিলেন বিপদে স্মরণ কর্‌লেই আমি আস্‌বো, এখন কি সব ভুল্লেন?" অমনি জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"বৎস! ভুলি নাই। সংসার পরীক্ষার স্থল, তাই তোমার পরীক্ষা আজ শেষ হ'ল। সেই—দীক্ষার দিন মনে পড়ে? সেই একদিন আর আজ একদিন। সংসারের সাধ এতদিনে তোমার মিটেছে। কামিনী ত্যাগ করতে পার নাই, রাজ্যলোভও হৃদয়ে জাগরূক ছিল; সে সব এইবার সব শেষ হ'য়েছে। তোমার সতী-স্ত্রী স্বর্গারোহণ করেছে, তুমিও সংসার হইতে বিদায় নিলে। এস বৎস! আমার সঙ্গে এস, আর মায়া মমতায় আত্ম-বিস্মৃত হইও না, আর সংসারের অনিত্য খেলায় মুগ্ধ হইও না, আর কোন বিষয়ে লোভ করিও না। এখন এস, ভগবচ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত কর, এমন পরমানন্দ আর কিছুতেই পাবে না। ভয় নাই, প্রহরীদের নিদ্রা শীঘ্র ভঙ্গ হবে না, পিঞ্জরের দ্বার খোলা, বাহিরে এস, সেই অনাথের নাথ ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।" রাজা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইল, ধীরে ধীরে পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গুরুদেবের চরণে পতিত হইলেন, তারপর গুরুদেবের সঙ্গে অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরীর পরিণাম।

ভুবনেশ্বরী সৈন্যদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। যখন তাহারা ভগ্ন মন্দিরে পিঞ্জর নামাইল, তখন ভুবনেশ্বরী একটি বৃহৎ পাদপের মূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। রাত্রে আর কোন আশঙ্কা নাই, আবার প্রাতঃকালে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভুবনেশ্বরী পিঞ্জরের নিকট আসিল, দেখিল, তখনও সৈন্যগণ ঘুমাইতেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তথাপি ভুবনেশ্বরীর ঘোর হইল, পিঞ্জর বিরুক-

শূন্য। তখনই সে সৈন্যগণকে ডাকিয়া তুলিল। তাহারা সচকিতে উঠিল, এবং ভোর হইয়াছে দেখিয়া বাহকদিগকে ডাকিল ও যাত্রার আয়োজন করিল। ভুবনেশ্বরী বলিল—"দেখ দেখি, পিঞ্জরে বন্দী আছে কি না।" সকলের তখন ভয় হইল,একজন পিঞ্জরের নিকট আসিয়া দেখিল—পিঞ্জরে বন্দী নাই, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈন্যেরা সকলে পিঞ্জরের নিকট আসিল, দেখিল সত্য সত্যই পাখী উড়িয়াছে, তখন সকলের ভয় হইল। যে চারিজন প্রহরীর জাগরিত থাকার কথা, তাহারা অনায়াসে বলিল যে, তাহারা রীতিমত পাহারা দিয়াছে, কোন লোককে নিকটে আসিতে দেখে নাই। তখন সকলের মনে ধারণা হইল—কোন দেবতা বা অপদেবতা এই কার্য্য করিয়াছে। একজন ভুবনেশ্বরীকে দেখাইয়া বলিল—"এ লোকটা আমাদের সঙ্গে কেমন ক'রে এল,বোধ হয়, এই কার্য্য ইহারই।" তখন সকলে মিলিয়া ভুবনেশ্বরীকে ধরিতে গেল,এবং বন্দীর পরিবর্ত্তে ইহাকেই বাদশাহের নিকট লইয়া যাইবে এই-রূপ পরামর্শ করিল। তখন ভুবনেশ্বরী বুঝিল, তাহার ভয়ানক বিপদ, সে সুমিষ্ট স্বরে বলিল—"তোমরা বৃথা আমাকে সন্দেহ কচ্ছো। আমি চিরকাল রাজার বিপক্ষ। তাহার প্রাণদণ্ড দেখবো বলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। তোমাদের বাদশাহ আমাকে জানেন। আমার প্রতি কোন অত্যাচার ক'র না, আমি স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।" সৈন্যেরা তাহা শুনিল না, তাহারা ভুবনেশ্বরীকে বন্দী করিতে চেষ্টা পাইল। তখন সে ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বক্ষঃস্থল হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া বলিল—"নরাধম! তোরা নিজে বন্দীকে রাখতে পারলি না,আর আমার প্রতি অত্যাচার। আমি সব বুঝতে পেরেছি, আমি বাদশাহকে বলবো যে ইহারা জহরতের প্রলোভনে রাজাকে ছেড়ে দিয়েছে। সাবধান! আমার দিকে যে অগ্রসর হবে তার মৃত্যু।" সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রথমতঃ কিছু বলিল না, তারপর পরস্পর বলিল যে,এই ব্যক্তি গৌড়নগরে গেলে ভয়ানক অনিষ্ট হবে, ইহাকে আবদ্ধ কর, তারপর যাহা হয় করা যাবে।" তাহারা ক্রমে ভুবনেশ্বরীকে ধরিয়া ফেলিল। ভুবনেশ্বরী দেখিল—এত লোকের হস্তে তাহার রক্ষার উপায় নাই, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"রে পিশাচগণ! আমার প্রতি এই অত্যাচার? জানিস্ আমি কে? আমি কামরূপের রাজ-কন্যা। রাজা নীলাম্বর আমার পিতৃ-রাজ্য নষ্ট করেছে, তাই আমি তাঁহার পরম শত্রু ছিলাম। আমার উদ্যোগেই গৌড়েশ্বর এই রংপুর রাজ্য আক্রমণ করেছেন। আমাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য? এই ছাখ, হিন্দু-রমণী কেমন ক'রে মরে।" এই বলিয়া ছোরাখানি নিজবক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

উপসংহার।

রাজা নীলাম্বর রাস্তা হইতে ঐ ভাবে অদৃশ্য হইলে তাঁহার বহু অনুসন্ধান হইল, কিন্তু তাঁহাকে

আর পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও তিনি দেবঅংশবিশিষ্ট এই ধারণা করিল। স্থানীয় লোকের ধারণা যে তিনি পুনরায় এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিবেন। ভুটিয়া, কোচ, যবন প্রভৃতি জাতি যখন অত্যাচার করিবে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের দমনের জন্য রাজা নীলাম্বর আসিবেন।

গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহ রংপুর রাজ্য দখল করিয়া আসাম বিজয়ে যাত্রা করিলেন, সেথায় তাঁহার বহু সৈন্য নষ্ট হয় কিন্তু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনার পরেই রংপুরে মুসলমানদিগের ক্ষমতা কমিতে থাকে। এবং কতক কতক স্থান হস্তভ্রষ্ট হয়। ইহার পর কোচ্ জাতি আসিয়া হোসেন শাহকে রংপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়।

হংসেশ্বর রায়কে ধরিয়া বন্দী অবস্থায় গৌড় নগরে আনা হইল, গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যখন রাজাকে পাওয়া গেলনা, তখন একজন সৈনিককে আবদ্ধ রাখিয়া কি হইবে। ঘোড়াঘাট দুর্গ মুসলমানেরা দখল করিল, অতএব দুর্গরক্ষক ও তাঁহার কন্যা সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হংসেশ্বর রায় বহু অনুসন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে সরসীবালার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি সপরিবারে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া আপন রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সতীত্বের আদর্শ রাণী মলয়াবতী ঐ ভাবে প্রাণত্যাগ করিলে ঘরে ঘরে দেবীর ন্যায় তিনি পূজিতা হইতে লাগিলেন।

হোসেন আলি প্রভৃতি কয়েক ভ্রাতা গৌড় নগরে গিয়া বসতি করিল ও বাদসাহের সৈন্যরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত যে সন্ন্যাসিনী ভগ্নমন্দিরে সঙ্গীতের স্বরে বিষ্ণুস্তব পাঠ করিতেছিলেন, তিনি প্রায় দেবালয়েই গমনাগমন করিতেন।

ভুবনেশ্বরী যুবকের বেশ ধারণ করিয়া মুসলমানের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার প্ররোচনায় শচীপাত্র গৌড়নগরে যায়। ভুবনেশ্বরী যদি সন্ন্যাসীনির সুপরামর্শ শুনিত, তবে এই হিন্দুরাজ্য মুসলমানের করতলগত হইত না এবং তাহারও এরূপ ভীষণ পরিণাম হইত না।

সমাপ্ত।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

সাধন-তত্ত্ব।

গৃহী জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীকে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন গৃহীকে, "সাধনা কাহাকে বলে?" জ্ঞানীর মনে সন্দেহ হয় "সাধনা কি?" ভক্ত ভাবিতে থাকেন "সাধনা কি।" ফকির সাধনবলে নৃত্য করিতেছেন, কঠোর নিষ্ঠাবান্ সাধনা কি, স্থির করিতে পারিতেছেন না; সাধনের মীমাংসা করিতে পণ্ডিত শাস্ত্র-বেদ উদ্ঘাটন করিলেন, সন্দিগ্ধচিত্তে শিষ্য সাধনতত্ত্বের নিমিত্ত গুরুর নিকট গমন করিলেন। এই একটী মাত্র ব্যাপার লইয়া জগতে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে; সমগ্র মনুষ্য-সমাজ সাধনের মীমাংসার জন্য

প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই শ্রোতা ভাবিতেছেন, "সাধনা কি?" বক্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সাধনা কি?" ভগবান হরিই ইহার মীমাংসা করিবেন। মনুষ্যমণ্ডলী অসমর্থ হইয়াছে।

হে সাধক, তুমি ত সাধন-পথে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "সাধনা কি?" ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? লক্ষণই বা কি? ইহার কর্ত্তাই বা কে? কোন্ অপাদান হইতে ইহা নিঃসৃত? কোন অধিকরণে ইহা স্থিত? কাহার সহিতই বা ইহার সম্বন্ধ? সহসা এরূপ গুরুতর বিষয়ের উত্তর প্রদানে সাধক সক্ষম নহেন। ভাবুকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবুকই ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসলেখক; তাঁহারই নিকট সাধন-সাম্রাজ্যের মানচিত্র পাওয়া যাইবে। আইস, উপাসক-সম্প্রদায়, ভাবুকের হৃদয় লইয়া, আমরা ইহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই। পথ প্রদর্শক হউন ভগবান, উপদেষ্টা হউন কৃপাময় হরি।

যখনই আমাদের কোন অভাব বোধ হয়, তখনই আমরা সেই অভাব মোচনের জন্য সচেষ্ট হই। জীবমাত্রেরই ইহা প্রকৃতিগত। ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, শরীরে আর বল পাইতেছ না, বায়ু সেবনে বা অঙ্গসঞ্চালনে তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না, সুতরাং খাদ্যের জন্য তোমাকে ব্যগ্র হইতে হইবে। প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছ, সুস্বাদু খাদ্যে বা স্নিগ্ধ আলোকে বা সুমিষ্ট সঙ্গীতে ইহার শান্তি হইবে না, জল পান না করিলে আর নিস্তার নাই। দেহে রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, শরীর দিন দিন ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হইতেছে; যতদিন ঔষধ না সেবন করিবে, তত দিন আর স্বাস্থ্য লাভের আশা নাই। ক্ষুধিতের অন্নই অভাব, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়ই অভাব, আর রোগীর স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধই অভাব। যখনই এই অভাব উপস্থিত হয়, তখনই অভাবমোচনের ইচ্ছাও জাগরিত হয়; প্রকৃতি এ বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী। আবার ইচ্ছা হইতে চেষ্টা ও কার্য্য সংঘটিত হয়; আর অভাব পূরণই কার্য্যের বিরাম ও ইচ্ছার নিবৃত্তি। এই কার্য্য, চেষ্টা, ইচ্ছা সমুদয়ই অভাব-বোধমূলক।—এবং প্রকৃতিই এই অভাব বোধের হেতুভূত। প্রকৃতির নিয়মে শরীরে কোন না কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; এই প্রয়োজন বশতঃই অভাব বোধ ও তজ্জনিত মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া নিচয় হইয়া থাকে। প্রাণিজগতে যেমন ইহা এক মহাসত্য, ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়।

সংসারে এত বিলাস, এত আরামের দ্রব্য থাকিতেও মানবাত্মার সম্যক্ তৃপ্তিসাধন হইল না। শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, আত্মারও সেইরূপ আছে। অন্নে বা পানীয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হয়, কিন্তু আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের পদার্থ সংসারের বিলাসভোগ সুখ, দুঃখে রক্ষিত হয় নাই। তাই ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা, সংসার সেবন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। সংসারের অতীত উপাদানে আত্মা গঠিত, তাই আত্মার আহার-পানীয় সংসারে পাওয়া অসম্ভব। ভাগবতী প্রকৃতিই আত্মাকে এরূপ করিয়া রচনা করিয়াছেন; ভাগবতী প্রকৃতিই ইহাকে অতৃপ্তিকর সংসারে নিবাস করাইতেছেন; সুতরাং তিনি এই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অভাব বোধের কারণ।

রসলুব্ধ হৃদয, নীরস সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া আরাম পাইতেছে না, প্রকৃতির নিয়মে, ইহাকে রস অন্বেষণ করিতেই হইবে। এই তৃপ্তিবাসনা ও চেষ্টাতেই সাধনের সূত্রপাত হইল, হৃদয় অভাবমোচনের জন্য ব্যস্ত হইল, পীড়িত আত্মা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রযত্নশীল হইল। সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, তৃপ্তিকর স্বাস্থ্যকর বস্তু তথায নাই, অন্তর্দ্দেশে দেখিতে পায, রোগ-বিকারের প্রাদুর্ভাব। তখন অস্থির হইযা হৃদয জিজ্ঞাসা করে, "অভাব ত আমার প্রচুর, কিন্তু কোথায় যাইলে এ অভাবের মোচন হয?" যতই সময় অতীত হয়, এই অভাববোধ ততই বৃদ্ধি পায়; তৃপ্তিসাধনার স্পৃহাও বলবতী হয়। তখন ব্যস্ত হইয়া হৃদয জিজ্ঞাসা করে, "কে আছ, আমায় কে বলিয়া দিবে, আমার অভাবই বা কি ও তাহার নিরাকরণই বা কি প্রকারে হইতে পারে?" ক্রমশঃ এই অতৃপ্ত অভাব তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে; অধীর হইযা মানব-চিত্ত শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, তীর্থপর্য্যটন আরব্ধ হয়, গুরুর উপদেশে ও সাধুর আখ্যা-য়িকা শ্রবণে মন আকৃষ্ট হয। কিন্তু ইহার কোনটীতেই সম্যক্ সদুত্তর প্রাপ্ত হওযা যায় না।—পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে নদীর উৎপত্তি; কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে নদীর বিরামের স্থান নাই; দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াও আরামস্থল প্রাপ্ত হয় না; অবশেষে উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহবেগে কত রাজ্য বিধৌত করিয়া, যখন সমুদ্র-সঙ্গমে উপনীত হয়; তখন বিরামস্থল লব্ধ হয়। যতদিন সাগরসঙ্গম প্রাপ্ত না হয়, ততদিন নদীর বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন মানবাত্মার অভাব বস্তুর নিরূপণ ও অধিকার না হয়, তত-দিন আর তাহার শান্তি নাই। পর্ব্বত হইতে সমুদ্রের প্রতি যেরূপ নদীর গতি অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ অশান্ত মানবাত্মার শান্তি-নিকেতন প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধ। নদীর সহিত সমুদ্রের সম্বন্ধ, তাই সমুদ্রের অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নদী সাগরসঙ্গমে ধাবিত হয়—সম্বন্ধই অভাবের কারণ এবং অভাব তৃপ্তিরও কারণ। মানবাত্মার সহিত কাহার সম্বন্ধ? কাহার জন্য ইহা লালা-যিত হয়? কোন সাধ্য বস্তুর ক্ষুধা প্রজ্জ্বলিত হওয়াও আত্মার সংসার অশান্তিময় বলিয়া বোধ হয়? সাধুর মুখে বা শাস্ত্রের অক্ষরে ইহার উত্তর অবগত হইলে কোন ফল নাই। হে সাধক, তোমাকে এই সম্বন্ধ স্বয়ং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষা ভিন্ন, সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। শ্রদ্ধা ও ব্যগ্রতার সহিত পরীক্ষা কর, দেখিবে—তোমার অতিদৃঢ় সম্বন্ধ ভগবানের সহিত চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে—আর এক ক্ষীণ রজ্জুতে, সংসারের সহিত তোমার আত্মার ক্ষণিক যোগ রহিয়াছে। তোমার আত্মা ভগবানের উপাদানে গঠিত, তাঁহার অভিমুখে ইহার স্বাভাবিকী গতি, সংসারের বন্ধনে এই গতি প্রতিহত হইতেছে। এই মোহরজ্জু যখনই ছিন্ন হইবে, তখনই ভগবানের সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন মিলন স্থাপিত হইবে। সংসাররজ্জুছেদনই তোমার প্রকৃত সাধনা; ভগবানই তোমার একমাত্র গতি। তাঁহাকে প্রাপ্তিভিন্ন আর এ ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই, এ ভবরোগেরও শান্তি নাই। অতএব হে সাধক, ভগবানই তোমার সাধনের মুখীভূত

কারণ; ইহার উৎপত্তি ও গতির কর্ত্তা তিনিই; তাঁহারই দ্বারা সাধনের অঙ্গবৃদ্ধি হয়; তাঁহার সহিত তোমার সাধনের একমাত্র সম্বন্ধ। ইহা ত হইল সাধনের সংক্ষিপ্ত কথা।

তাহার পর সাধনের লক্ষণ কি? হে সাধক! তুমি বিস্মিত হইও না—সাধনের প্রধান লক্ষণ—অতি সহজ। তুমি পরীক্ষা কর দেখিবে, ইহা সহজ কি কঠোর। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্নভোজন বিশেষ কঠিন নহে—সেইরূপ আত্মার ভগবানকে লাভ করাও কঠিন নহে। পাপী কি পুণ্যাত্মা, ভাবুক বা সাধক, সমুদয় জীবই এক প্রেমের রজ্জুদ্বারা ভগবানের সহিত আবদ্ধ—এই ভালবাসা বশতঃই তুমি সংসারে শান্তিলাভ করিতে পার না—যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাহার প্রেম প্রগাঢ়—তাঁহার নিকট ভিন্ন আর কোথায় বিরাম পাইবে? প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে—প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় প্রেমময়কে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণের প্রতিবাদী হইয়া সংসারের মোহ উপস্থিত হইল। প্রেমিকে প্রেমিকে যোগ সংস্থাপন হইতেছে—কোথা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়া বাধা দিতে উপস্থিত হইল। বাধা পাইলে প্রণয়-বেগ প্রবলতর হয়, প্রেমশাস্ত্রের রীতি; হৃদয় এই প্রবৃত্তির বাধা সহ্য করিতে পারে না—যেমন করিয়াই হউক এই বাধা দূরীভূত করিতেই হইবে। হে সাধক, মনে করিও না—এই প্রবৃত্তিত্যাগ অতি কঠিন কার্য্য। তোমাকে একজন অবিরাম প্রেম-দান করিতেছেন—তুমিও তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছ—অতএব প্রেমময়ের সহিত মিলিত হইতে তুমি কি না করিতে পার? প্রবৃত্তির অপেক্ষা ভগবানের প্রতি তোমার প্রণয় অধিক; তাই ভগবানের জন্য তুমি প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পার। প্রিয়তমের জন্য অপ্রিয়বস্তু ত্যাগ সাধকের পক্ষে সহজ ভিন্ন কঠিন হইতে পারে না। তাই কোন সাধক বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন, কেহ বা নিজের সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবহিতে রত হয়েন; কেহ বা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন—কিন্তু এ সমুদয়ের কিছুই তাঁহাদিগের নিকট কঠিন নহে। প্রিয়বস্তুর নিমিত্ত অপ্রিয়বস্তু ত্যাগ অতি সহজ কার্য্য। কিন্তু এই মোহশৃঙ্খল ছেদন অতি রহস্যময় ব্যাপার। প্রবৃত্ত অবস্থায় সাধক কত যত্ন কত আয়াস করেন, তথাপি হৃদয়ের ভগবদ্বিরোধিনী প্রবৃত্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, তুমুল সংগ্রামে তাহাদের বেগ হ্রাস হয়, কিন্তু একবারে লোপ হয় না—সাধক সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকেন—প্রবৃত্তিও দূর হয় না, প্রিয়বস্তুও অধিগত হয় না—এই বিপদকালে সাধক, অধীর হইবে না—ভগবানের নাম করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে; পাপপুণ্যে তাঁহারই নাম করিবে; ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইবে। অতি কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ ভূমি কিরূপে পরিষ্কৃত করিতে হয়, সাধক, তুমি তাহা বিদিত আছ—বারম্বার শাখা প্রশাখা ছেদেও কণ্টক তরু বিনষ্ট হয় না, তাহাদের মূল সর্ব্বদাই ভূমিতে নিবদ্ধ থাকে;—কঠিন ভূমি হইতে কণ্টকমূল উৎপাটন করা যাইতে পারে না—অগত্যা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়—বৃষ্টিজলে সম্যক্

অভিষিক্ত হইলে মৃত্তিকার কাঠিন্য দূর হয়—তখন অবলীলাক্রমে কণ্টকমূল উৎপাটন করা যাইতে পারে। সেইরূপ হে সাধক, তুমিও ভগবানের কৃপাবারির জন্য অপেক্ষা করিবে; যাই শুভক্ষণে তোমার হৃদয় আর্দ্র হইবে, অমনি প্রবৃত্তি নিচয়কে দূরে ফেলাইয়া দিবে; তোমাকে প্রয়াস পাইয়া কিছু কঠোর সাধনা করিতে হইবে না— যাঁহার ক্ষেত্র তিনিই পরিস্কৃত করিবেন।

আর এক কথা—সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিবে, তোমার মোহের রজ্জুর অগ্রভাগ ভগবানে নিবদ্ধ; তাঁহারই ইচ্ছায় মোহ আসিয়া তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে—যাই দেখিলে, ভগবানের রজ্জু ও সংসারের রজ্জু একই প্রেমের প্রকারভেদ মাত্র, তখনই সাধনপথে তোমার গতি অতি বেগবতী হইবে। যে প্রবৃত্তি পূর্ব্বে তোমার অন্তরায় ছিল, এক্ষণে তাহা তোমার সহায় হইবে। তুমি তখন—ধর্ম্মাধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পাপ পুণ্যকে দূরে রাখিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, প্রেমপথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে।

নিবিড় অন্ধকারময় গৃহে গৃহস্থ ক্ষীণ দীপ প্রজ্জ্বালিত করিলেন—গৃহের গবাক্ষাদি সমুদায় উন্মুক্ত,—প্রবলবেগে বায়ু আসিতেছে;—দীপ অতি ক্ষীণ, নির্ব্বাণপ্রায়;—গৃহস্থ ভীত হইয়া বর্ত্তিকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন—ক্রমে স্থুল স্থুলতর বর্ত্তিকা অর্পিত হইল—বায়ুর প্রভাব কিছুতেই রোধ হইল না; গৃহস্থ বর্ত্তিকা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাহ্য পদার্থ অর্পণ করিতে লাগিলেন—অগ্নি ক্রমশঃই সতেজ হইতে লাগিল, কিন্তু বায়ুর প্রভাব নিরস্ত হয় না; ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠখণ্ড অর্পিত হইতে লাগিল—অগ্নির তেজও তত বর্দ্ধিত হইল—কিন্তু বায়ুবেগ প্রতিকূলাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না; গৃহস্থ এক এক করিয়া যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাহ্যপদার্থ ছিল সমুদয়ই অগ্নিসংযুক্ত করিলেন, তথাপি অগ্নির স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ রহিল—তখন গৃহস্থ অনন্যোপায় হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড অগ্নিতে অর্পণ করিলেন—অগ্নি সংযোগে বৃহৎ কাষ্ঠ জ্বলিতে আরম্ভ করিল—ক্ষীণ দীপ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল—তখন বায়ুর প্রতিকূলাচরণ বন্ধ হইল—বরং যতই বায়ুর তেজ বৃদ্ধি হয়, ততই অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়—গৃহস্থ সহর্ষ চিত্তে সমুদয় বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, অবাধে বায়ু আসিয়া, অগ্নির সহায়তা করিতে লাগিল। সেইরূপ সাধনের প্রথমাবস্থায়, অতি ক্ষীণ জ্ঞানালোক হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়; দুর্ব্বার মোহ আসিয়া সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করে—হে সাধক, সেই সময় এক এক করিয়া তোমার যাহা কিছু আছে, সেই জ্ঞানাগ্নিতে অর্পণ করিতে হইবে। এক এক করিয়া বিষয় বাসনাগুলি যতই অর্পণ করিবে, অগ্নির তেজ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ক্রমে ক্রমে যখন সমগ্র বুদ্ধি, চিন্তা, কামনা, স্বার্থ, জীবন সেই অগ্নিতে অর্পণ করিবে, তখন তোমার প্রবৃত্তির হিল্লোল অনুকূল প্রবাহিত হইবে। অধোমুখী প্রবৃত্তি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া তোমাকে ভগবানের সন্নিধানে লইয়া যাইবে। প্রবৃত্তিরহিত, কর্ম্মাকর্ম্মরহিত, হৃদয়ের গতি তখন আর কেহ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥"

"ধ্যান নিষ্ঠগণ জ্ঞান প্রজ্বলিত আত্মসংযম যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।"

ভগবানের কৃপাতেই সেই সমুদয় সংসাধিত হয়। তোমার উপর ভগবানের প্রেম অসীম, কৃপাও অসীম; অতএব এই কৃপাবলে তোমার পরমার্থ-প্রেম সহজেই সম্পন্ন হইবে। এই সমুদয় পরীক্ষা করিলে, সাধক জানিতে পারিবে যে, সাধন অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য—তখনই বুঝিতে পারিবে যে, সাধন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের দ্বারাই নিয়মিত ও ভগবানের কৃপায় অবস্থিত। মোহের আক্রমণ, হৃদয়ের অভাববোধ, সাধনের সূত্রপাত, প্রবৃত্তির প্রতিরোধ, প্রবৃত্তির সখ্য, প্রেমময়লাভ, সমুদয়ই ভগবানের প্রেমে অবস্থিত। তাঁহার কৃপায় সাধক-জীবনে, এ সকল অতি সহজেই সংঘটিত হয়। এখন প্রতীয়মান হইবে যে—সাধনের কর্ত্তা ভগবান্, ভগবানের প্রেম অপাদান হইতে ইহা নিসৃত; ভগবানের কৃপাকরণে পরিবর্দ্ধিত, ভগবন্মহিমার অধিকরণে অবস্থিত; ভগবানের সহিতই সাধনের সম্বন্ধ, ভগবানই উদ্দেশ্য; আর ভগবানের কৃপামূলত্ব হেতু সাধন সর্ব্বদাই সহজ।

এই সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া, হে সাধক, তুমি পাপ দেখিয়া ভীত হইও না। ভগবানের নাম করিয়া পাপের সম্মুখীন হইবে—দেখিবে সমুদয় পুণ্যময় ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে। দুঃখ কষ্ট দেখিয়া নিরাশ হইও না, ভগবানের কৃপায় সমুদয় অমঙ্গল দূর হইবে। হৃদয়ের দুর্ব্বার প্রবৃত্তি দেখিয়া হতাশ হইও না, ভগবানের কৃপায় দেখিবে—প্রবৃত্তি পুণ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে সুখে থাক, দুঃখে থাক, পাপীই হও, আর পুণ্যাত্মাই হও—যখন যে অবস্থাতেই থাক, আশার সহিত প্রাণ ভরিয়া বলিবে, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং"—কৃপাময় হরি পাপ দূর করিয়া শান্তি প্রদান করিবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রকৃতি তত্ত্ব।

জীব-রাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীব-রাজ্যের মধ্যে মৎস্যের প্রথম প্রকাশ। বহুদিন পৃথিবী জলমগ্ন থাকায় জলচর জন্তুই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর জলে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক জল-জন্তুর বিকাশ হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেক জল-জন্তুর লোপ হইয়াছে। স্থলে এক্ষণে যে সকল জন্তু অবলোকন করা যায়, কিছু পরিবর্ত্তিতভাবে জলে তাহাদিগের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, যথা—সিন্ধু-ঘোটক ইত্যাদি। জলে এরূপ জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাদিগের অবয়ব কতক পরিমাণে মৎস্যের ন্যায়, কতকাংশ নরাকারের ন্যায়। এখনও সমুদ্রে যে কতপ্রকার জন্তুর আবাস, তাহা সংখ্যা করা যায় না। চিঙ্গড়ী মৎস্য, কি ইচ্‌লা মাছ বা কর্কট প্রভৃতি জন্তু কোন সময়ে যে পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে

পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইবার কিছু সময় পূর্ব্বে উপরোক্ত জীব সমুদয়ের উদ্ভব হইয়াছিল ইহাই বোধ হয়।

কিভাবে প্রথমতঃ পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। এক্ষণে যাঁহাবা প্রশান্ত-মহাসাগর পোত দ্বারা পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তথায় কিভাবে এক্ষণে দ্বীপোৎপত্তি হইতেছে, তাহা তাহারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। প্রবাল নামক একরূপ পতঙ্গ দ্বাবা তথায় বহুল দ্বীপের উৎপত্তি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কিন্তু যে সময় পৃথিবীতে প্রথম স্থলের প্রকাশ হইয়াছিল, তখন পৃথিবীতে প্রবাল নামক পতঙ্গের উদ্ভব হয় নাই। পতঙ্গ জাতীয় জন্তু পৃথিবীতে স্থল প্রকাশেব বহুকাল পরে উদ্ভূত হইয়াছিল। তবে প্রথমতঃ পৃথিবীতে কি উপায়ে স্থলভাগ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করা কঠিন। তবে অনুমান দ্বাবা যে যুক্তি স্থির করিতে পাবা যায়, তদ্দ্বারা বোধ হয় সূর্য্যাতপই এই স্থল প্রকাশের প্রধান কাবণ ছিল।

রজনীতে আকাশমণ্ডলে যে নক্ষত্রকুল অবলোকন করি, সে সব অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল ভাবে প্রকাশিত নহে। তাহারা নিয়মাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই অগণন তারকা ও নক্ষত্রকুল মধ্যে যে সকল নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, সে সব সূর্য্য, আর যে সব অল্প প্রভান্বিত, তাহারা গ্রহ ও উপগ্রহ। গ্রহ ও উপগ্রহদিগের নিজের প্রভা নাই। তাহারা তপনালোকে আলোকময় হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহ-উপগ্রহ এক একটী সৌর-জগৎ অন্তর্ভুক্ত। এক একটী সূর্য্য কতকগুলি গ্রহ চন্দ্র বেষ্টিত। তাহারা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে ও উপগ্রহগণ ইহাদিগের নিকটবর্ত্তী গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। এবং গ্রহ উপগ্রহগণ সূর্য্য হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইয়া আলোকময় হইয়া থাকে।

জলে যে সব জল জন্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহারা জীবনীশক্তি-সম্পন্ন। তাহাদিগের জীবন অচিরস্থায়ী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা যে অল্প ছিল এরূপ বোধ হয় না। তাহারা অসংখ্য ও অগণণ ছিল। তাহারা মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইলে তাহাদিগের অস্থি চর্ম্ম ইত্যাদি জলে নিমগ্ন হইত, ইহা অসংশয়িত। এই অসংখ্য ও অগণন জীব-জন্তু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইয়া তাহাদিগের কঙ্কাল, অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি জলমধ্যে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই সকল পদার্থ যে জলে মিশ্রিত হইত না, তাহা অধুনাতন অভিজ্ঞতা ও বহু দর্শন দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সেই জলস্থ প্রকাণ্ড অস্থি, মাংস, কঙ্কাল ও চর্ম্মের স্তূপ প্রখর সূর্য্য কিরণে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুযুগ পরে যে স্থলভাবে পরিণত হইয়াছিল, ইহাই যুক্তি দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়। আর অন্য কোন যুক্তিদ্বারা এ সম্বন্ধে কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। শম্বুক জাতীয় জন্তু যথা শঙ্খ, কড়ি ইত্যাদিব কঠিন আবরণ স্থল প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল। পৃথিবীতে স্থল প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে উভচর প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল। কচ্ছপ ইত্যাদি উভচর জন্তু। পৃথিবীতে উভচর জন্তুর উদ্ভবের পর সরীসৃপ জন্তুর বিকাশ

সর্প ইত্যাদি সরীসৃপ। সরীসৃপ বিবিধ। শম্বুক জাতীয় জন্তু যত প্রকার আছে, ইহারা উভচর। ধরণী স্থলপূর্ণ হইলে, বহুদিন পরে অন্যান্য স্থলচর জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। স্থল প্রকাশের বহুযুগ পরে পতঙ্গ জাতীয় জীবের প্রকাশ হইয়াছিল। পরে খেচর পাখী আদির উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়। পরে অন্যান্য খেচর বিহঙ্গের আবির্ভাব হয়। ভূতলের অরণ্যসমূহে শ্বাপদ চতুষ্পদ জন্তুকুলের উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে আকাশে পক্ষীকুল উড্ডীন হইত, ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। স্থল প্রকাশের পরে মেদিনীমণ্ডলে যে বিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছিল—ইহা প্রতীত হয়।

ধরণীতে ভূভাগের সৃষ্টি হইলে প্রাণ-যুক্ত চেতন প্রাণী-পুঞ্জের ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে প্রাণময় সচেতন উদ্ভিদের কিরূপে উদ্ভব হইল—ইহা আলোচ্য বিষয়। বীজ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি। পৃথিবীতে যে সময় উদ্ভিদ-রাজ্য প্রকাশিত হইল, তখন যে একরূপ উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা কোনমতে যুক্তিযুক্ত বাক্য নহে। বিবিধ উদ্ভিদ তথায় উৎপন্ন হইয়াছিল। উভচর জন্তুর প্রকাশের পর বা পূর্ব্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল কি না তাহা এক্ষণে আলোচ্য। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ভাবে স্থল প্রকাশ না হইলে উদ্ভিদের উদ্ভব হয় নাই—ইহা যুক্তিযুক্ত। তথায় স্থলের পূর্ণ প্রকাশ হইলে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে বিবিধ উদ্ভিদের বীজ কি প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছিল, সে বিষয়ে বলা দুষ্কর। যে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে বিবিধ জীবের প্রকাশ, সেই ইচ্ছা-প্রভাবে বিবিধ উদ্ভিদেরও উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে এই মীমাংসা ভিন্ন অন্য কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। ক্রমে পৃথিবী স্থলময়ী হইলে স্থলে বিবিধ জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। পৃথিবী জলে স্থলে জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও প্রকৃতির প্রিয়-পুত্র মানবের সহিত পৃথিবীর সন্দর্শন মাত্র হয় নাই। তখনও ধরণী মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট জীবের বাস উপযোগী হয় নাই। তখনও পৃথিবীর ভূমি সিক্ত ও কর্দ্দম রাশিতে পূর্ণ। যুগযুগান্তর ধরিয়া সূর্য্য প্রচণ্ড রৌদ্র প্রকাশেও পৃথিবীর ভূমি কঠিন করিতে সক্ষম হয় নাই। তখনও মানবের সুখ সুবিধা ও সচ্ছন্দতা হেতু দ্রব্য সমূহ পৃথিবীতে সঞ্চিত হয় নাই। তখনও পৃথিবীতে প্রস্তর যুগের উদয় হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তথায় প্রস্তর যুগের প্রকাশ হইয়াছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তর বহুদিন জলমগ্ন থাকিয়া নৈসর্গিক উপায়ে তাহা কঠিন হইতে আরম্ভ হয়। সে সময় পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড সরীসৃপকুলে আচ্ছন্ন ছিল। পৃথিবীর অরণ্যে বৃহৎ আকারবিশিষ্ট চতুষ্পদকুল পরিভ্রমণ করিত। পৃথিবীর অভ্যন্তর কিছু কঠিন হইলে, তথায় গন্ধকাদি অধাতব পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই সব দ্রব্য দ্বারা আগ্নেয় উৎপাত সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা ভস্মরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পাষাণে পরিণত হইয়াছিল। মহাসাগরের আগ্নেয় উৎপাৎ বাড়বানল বলিয়া খ্যাত। যে সময় সাগরগর্ভে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে পৃথিবীতে যুগ আরম্ভ হয়, তাহা

প্রস্তর-যুগ বলিয়া অভিহিত। এই আগ্নেয় উৎপাত ধরণীমণ্ডলে মৃত্তিকা উদ্ভবের অন্যতম কারণ।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর জলমগ্ন অবস্থা হইতে স্থল-প্রকাশের সময় পর্য্যন্ত বিবিধ যুগে সে সময় বিভাগ করিয়াছেন। সেই সব যুগের বিষয়ে এক্ষণে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

এক্ষণে বিবর্ত্তনবাদ কি তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। এ প্রবন্ধের যে অংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সে অংশে বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিছু বিসদভাবে আলোচনার আবশ্যক। পাশ্চাত্য স্বভাবতত্ত্ববিৎগণ বলেন যে জীবের জাতি, শ্রেণী, কুল আদি নিত্য নহে। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল। এক জাতীয় জীব বিবর্ত্তনবাদের নিয়মানুসারে অপর জীবে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ব্বাচন দ্বারা বিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এক্ষণে দেখা যাক, এই কথার মূলে সত্য আছে কি না। উপরোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী বহু গবেষণা দ্বারা এই সব প্রচার করিয়াছেন। অতএব এই তত্ত্বের ভিত্তি যে সঙ্গত যুক্তির উপর সংস্থাপিত তাহার আর সন্দেহ নাই। উদ্ভিদ রাজ্যে এই বিবর্ত্তনবাদ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। উদ্ভিদ-রাজ্যও প্রাণময় এবং জীবরাজ্যও প্রাণময়। যদি উদ্ভিদ-রাজ্যে এই নিয়ম স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়, তবে তাহা যে জীব-রাজ্যে ঘটিতে পারে না, ইহা কেহ অসঙ্কুচিতভাবে বলিতে পারেন না। আমরা যে এক্ষণে বিবিধ ধান্য গাছ দেখিয়া থাকি, তাহারা শ্যামা নামক ঘাসের প্রকৃষ্টভাবে উন্নতি-সাধন দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। কাষ্টমল্লিকা বনে, অরণ্যে, জঙ্গলে যথেচ্ছভাবে সমুৎপন্ন হয়। তাহাদিগের উৎপত্তি হেতু কেহ যত্ন-চেষ্টা করে না। তথাপি তাহারা আপনাপনি সমুৎপন্ন হইয়া পুষ্প প্রসব করিয়া বন জঙ্গল গন্ধে আমোদময় করে। বেল ও কাষ্টমল্লিকা যে একজাতীয়, তাহাদিগকে দেখিয়া এক্ষণে কেহ স্থির করিতে পারে না। কিন্তু মানবের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা কাষ্টমল্লিকা হইতে বেলমল্লিকার উৎপত্তি। একপাটি ও দোপাটি ফুলের গাছ বর্ষা আরম্ভে উৎপন্ন হইয়া শীতের প্রারম্ভে বিনষ্ট হয়। এই দুই প্রকার ফুলগাছ এক-জাতীয়। কিন্তু একগাছে একটী দল-বিশিষ্ট ফুলের উৎপত্তি হয়, অন্য বৃক্ষে মনোহর বহু দলবিশিষ্ট ফুল উৎপাদিত হইয়া থাকে। এ প্রভেদ কেবল মানুষের চেষ্টা ও যত্নজনিত। যে কৃষক স্বীয় ক্ষেত্র বিশেষভাবে চাষ করিয়া ও তাহাতে অধিক পরিমাণে সার গোময় দিয়া অতি যত্ন সহকারে ফসল বপন করে, তাহার শস্যের একরূপ অবস্থা হয়, আর অন্য কৃষক সেরূপ করে না, তাহার ফসলের অবস্থাও অতি নিকৃষ্ট হয়। কৃষকদিগের যত্ন, পরিশ্রম ও প্রয়াস দ্বারা আলুর বিবিধতা ও বিভিন্নতা হইয়াছে। জল বায়ুও উদ্ভিদরাজ্যে বিবর্ত্তনের সহায়তা করিয়া থাকে। ইক্ষু এক জাতীয় উদ্ভিদ। কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। ইহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। সমস্ত আম্র একজাতীয় কিন্তু তন্মধ্যে কতক অম্লরসপূর্ণ, কতক অপেক্ষা

কতক অম্লরসহীন ও কতক একেবারে মধুরতাপূর্ণ। ইহাও উপরোক্ত নিয়মের ফল। রঙ্গার বিভিন্নতাও এই নিয়মের অতীত নহে। মানবের চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা অনেক প্রকার উদ্ভিদ অন্য প্রকার উদ্ভিদে পরিণত হইয়াছে।

সমস্ত সর্ষপ একজাতীয়। কিন্তু মনুষ্যের বিশেষ চেষ্টা পরিশ্রমে ও যত্নে ইহারা নানা শ্রেণীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে চিনা নামক একপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। ইহার গাছ তৃণবৎ। চিনার গাছ দেখিলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে যাবতীয় ধান্যগাছ এক তৃণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তরমুজ বঙ্গের নানাস্থানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু খোকসা ও গোয়ালন্দ প্রদেশে যে তরমুজ উৎপন্ন হয়, তাহা বৃহৎ ও সুস্বাদু। এইস্থানের তরমুজের সহিত অন্য স্থানের তরমুজের তুলনা করিলে উক্ত প্রদেশীয় তরমুজকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। অন্য স্থানের তরমুজ ক্ষুদ্রাকার ও ভাল স্বাদহীন। প্রকৃষ্টভাবে উপরোক্ত দেশীয় তরমুজের বহুদিন আবাদ করিলে, তাহা যে উন্নত কোন ফলে পরিণত হইতে পারে না, কেহ বলিতে পারে না। উদ্ভিদ-রাজ্যে যখন বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, জীব-রাজ্যে তাহা যে নাই এরূপ বলা যায় না।

পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনেক জাতীয় প্রাণীর বিবর্ত্তন তাঁহারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে সমস্ত জাতীয় বা শ্রেণীয় জন্তুদিগের বিবর্ত্তন তাহাদিগের দ্বারা যে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অনেক জলচর জন্তু বিবর্ত্তিত হইয়া স্থলচর জন্তুতে পরিণত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যায়।

এই বিবর্ত্তনের মূলে নিয়মদ্বয় বর্ত্তমান আছে সেই নিয়মানুসারে এই বিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম নিয়ম প্রকৃতি নির্ব্বাচন। জীবন-সংগ্রামে স্বভাব যোগ্যতম জন্তুকে রক্ষা করিয়া থাকে। অযোগ্য জীব জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া তিরোধান হয়, ইহাই প্রকৃতি-নির্ব্বাচন। যোগ্যতমের উজ্জীবন দ্বারা কোন জাতীয় জন্তু মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ তাহার প্রাণ রক্ষিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকানাইলাল নাগ।

শৈব।

রৌদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিতব ভস্মভরা কলেবর,
শিরে শোভে দীর্ঘ জটা দীপ্তিদানে নিরন্তর।
অক্ষমালা গলে তব সদ্য পাপ বিনাশন,
করে ধ'রে ত্রিশূল মহান্ ত্রিতাপ কর্‌ছ নিবারণ।
পরিধানে গৈরিক বাস, বাসের স্থান শ্মশানধাম,
ত্যাগী হ'য়ে ভোগের ঘরে তোমার পূর্ণ মনস্কাম।
ভস্ম পুণ্ড্র ভালে তব শোক দুঃখ বিনাশন,
পাপীর প্রাণে বিষম ভিতি দিচ্ছে আনি অনুক্ষণ।
তবাননে উচ্চারিত পুণ্যভরা ভবের নাম,
পূর্ণ ভাবে শান্তি বারি ঢাল্‌ছে ধরায় অবিরাম।

সুমহতী শক্তিতব সাহস ভরা তোমার মন,
গভীর নিশায় শবাসনে শিবের করছ আরাধন।
সাধন তোমার কঠিন বড কর্ম্ম তব শর্ম্ম-কর,
মর্ম্ম তব ধর্ম্ম-পূর্ণ ধৈর্য্য তোমার সহচর।
সেব্য তোমার সর্ব্বদর্শী সকল ত্যাগী মহেশ্বর,
রুদ্র রূপের উপাসনায় ভদ্র তোমার নিরন্তর।
ক্ষুদ্র নহ তুমি কভু বৃহত্তম ধরা ধামে,
ঐশপ্রেমে প্রাণ সপিয়ে, জয় করিয়ে শত্রু কামে।
বিষয়-বিলাস, লুব্ধনেত্রে চায়না তোমার মূর্ত্তিপানে,
মায়া, মিথ্যা মন খুলিয়ে কয়না কথা তোমার সনে
মণি মুক্তা লুপ্ত চেতন তোমারইত' দরশনে,
মানে মানে প্রাণ লইয়ে স্থান নিয়েছে খনির কোণে।
তোমার ভয়ে আকুল হ'য়ে কামিনীকুল মলিন মুখে,
অঞ্চলেতে বদন কমল মনের দুখে রাখছে ঢেকে।
ধন্য ভবে শক্তি শালিন্! ওহে শৈব সাধক বর।
ধন্যাতব ভবভক্তি মুক্তি দাত্রী নিরন্তর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।

ভক্তের প্রার্থনা।

মা ব্রহ্মময়ি! আর কতদিন আমাকে এ অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিবে মা? আশায় বুক বাঁধিয়া চলিয়াছি এ আশার কুয়াসা কবে অপসৃত হইবে মা? মা বিশ্বজননী এ বিশ্বে আমার বলিবার আর কিছুই নাই যে। কেবল তুমি মা আমার, তোমার করুণা কটাক্ষের উপর নির্ভর করিয়া আমি এ অন্ধকারে চলিয়া যাইতেছি। দিশাহারা একখণ্ড মেঘের মত শূন্যে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আর কতদিন এমন করিয়া থাকিব মা? মা শ্যামা ব্রহ্মস্বরূপিনী কালভয়হারিণী, একবার দয়া করিয়া আমার প্রাণের তীব্র জ্বালা শান্ত করিয়া দাও। আমি এ যন্ত্রণাময় কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

মা দয়াময়ি! দয়া করিয়া তুমি আমাকে সকলই দিয়াছিলে, আবার সকলই কাড়িয়া লইয়াছ। আমি এখন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল—নিঃসঙ্গ। আমার বলিবার, আমার আর কোন কিছুই নাই। মা ভক্তি স্বরূপিনী, কবে আমার মুখের দিকে তাকাইবে মা? কবে আমার "আমিত্ব" তোমার ঐ শ্রীচরণে লয় পাইবে মা? "তুমি আমি," তোমার আমার" করিতে করিতে সারা হইলাম। কবে "তুমি" লোপ পাইয়া "আমিত্বে" পরিণত হইবে মা? এমন দিন কবে আসবে মা, যেদিন "তুমি" বলিয়া কিছুই থাকিবে না। কেবল একমাত্র "আমি" চারিদিক ছাইয়া ফেলিবে। অদ্বিতীয় "আমি" পূর্ণভাবে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। "আমি"র অমর বীণা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত চরাচরে অহর্নিশি বাজিতে থাকিবে।

মা ব্রহ্মময়ী—দিন যে ফুরাইয়া আসিল—সূর্য্য অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িল—কবে আর আমাকে একেবারে আশা শূন্য করিবে মা?

"কোথায় মা শ্যামা—কর মা করুণা
অধম সন্তানে কেন বিড়ম্বনা।

মায়ার বন্ধনে হতেছি কাতর,
কালের কামিনী কালভয় হর,
এ জীবন অন্তে, রেখো পদপ্রান্তে,
কৃতান্তের করে কিঙ্করে দিও না।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু রাজার আদর্শ।

ওই যে দেবোপম সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাণ্ড প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইযা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন; বৃহৎ জমিদারীর কোথায় কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, প্রজারা মনের সুখে বাস করিতেছে কি না, কোথাও কোন প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইতেছে কি না, এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া নিজে অনুসন্ধান লইতেছেন; শত শত দরিদ্রা, পতি পুত্রহীনা রমণীর আবেদন নিজে পাঠ করিয়া ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেছেন, অর্থাভাবে অনাথ বালকের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, তাহার সুচারু বন্দোবিস্ত করিয়া দিতেছেন, অর্থসাহায্যে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন দেওয়াইতেছেন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, যে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ের অভাব, জমিদারীর মধ্যে সে স্থানে বিদ্যালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দিতেছেন; উনি কে?

ওই যে প্রাসাদলগ্ন বৃহৎ প্রাঙ্গনে বসিয়া শত সহস্র কাঙ্গালী চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ আহার সামগ্রী ভোজন করিতেছে, যিনি স্বহস্তে উহাদিগের পরিবেশন করিতেছেন, যাঁহার পক্ককেশ-মণ্ডিত শিরে, দীন-দুঃখীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নিয়ত বর্ষিত হইতেছে, সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকাণ্ড সভামণ্ডপের মধ্য-স্থলে বসিয়া যিনি সভাপতির কার্য্য করিতেছেন, যাঁহার নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গরিমা চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া পড়িতেছে—উনি কে?

ওই যে ৺বৃন্দাবনধামে কুম্ভক যোগের সময় পক্ককেশ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বপুঃ শত সহস্র দণ্ডী, পরমহংস, সাধুসন্ন্যাসীগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইতেছেন,—উনি কে?

আবার ঐ যিনি দিল্লীতে আসিয়া বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণা সভার সদস্যরূপে বিরাজিত; ঐ প্রবীণ-বহুদর্শী-স্বদেশ-বৎসল বঙ্গীয় সমাজের আধুনিক অবস্থাভিজ্ঞ সাধুপুরুষ দিল্লীর রাজ-সভা অলঙ্কৃত করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন,—উনি কে?

উনিই সেই কাশিমবাজারের "মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে-সি-আই-ই।

উনিই সেই বিদ্যাবঞ্জন, দয়ার সাগর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,—উনিই সেই পরদুঃখ-কাতর, পরম সাধু সচ্চরিত্র মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র; ইনি স্বদেশ হিতার্থে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, ইঁহার চরিত্র যেমন পবিত্র, হৃদয়ও সেইরূপ মহৎ উদার সরল ও উন্নত। ইনি হৃদয়ের মহত্বে, চরিত্রের উৎকর্ষে, ন্যায়পরায়ণ-

ন্তায়, প্রজাপালনে, পুণ্যশীলতায় ও আত্ম-ত্যাগে মহাযশস্বী ও পুণ্যশ্লোক মহারাজা নল এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতির মত প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছেন। যদ্যপি সেকাল আজ একালের মত থাকিত তাহা হইলে নিম্নলিখিত শ্লোকটী এইরূপ লিখিত হইত, যথা—

"পুণ্যশ্লোকো নলরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দনঃ।
পুণ্যশ্লোকো সার মণীন্দ্রঃ দেশহিতপরায়ণঃ॥"

ভারতে এমন সাধারণ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কোথাও হয় নাই, যেখানে দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বদান্যবর হস্ত প্রসারিত নহে। এই জন্যই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ভারতের আদর্শ মহা-রাজ, ভগবান! এই চন্দ্রকে চিরদীপ্তিমান রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযোগেন্দ্র।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আলোচনার উনবিংশ বর্ষ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার ফলে বালিকা "আলোচনা" বিংশ বৎসরে পদা-র্পণ করিল। আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সাধন-শক্তি ইহাকে এতাবৎকাল জীবিত রাখিতে সক্ষম হইত না যদি সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্ব-জননীর আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষিত না হইত। যাঁহার শক্তিতে আব্রহ্মস্তম্ভ জীবজগৎ শক্তিমন্ত-জীবিত, "আলোচনা" তাঁহারই কৃপাকটাক্ষে এই দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত থাকিয়া সকলের সেবা করিয়া আসিতেছে। আমাদের এ সেবার সহায় হইয়াছেন—আমাদের কৃপাময় পাঠক ও গ্রাহকবর্গ। মাতৃশক্তির প্রেরণায় তাঁহাদের সহানুভূতি সংযোজিত হইয়া যে ইহাকে বলযুক্ত করিয়া এতদিন জীবিত রাখিয়াছে—তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আলোচনার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিয়া অনেক মহানুভব গ্রাহক আমাদিগকে উৎসাহ-সূচক পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিতেছেন। এ ধন্যবাদের পাত্র আমরা নহে—মহামায়াই তাহার পাত্রী, তাহাদের "আলোচনার" প্রতি ভালবাসাই ইহার মূলীভূত কারণ—নতুবা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি কি এত বড় একটী মহৎ কার্য্য এতদিন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে! ত্রুটী অনেক হইলেও যে ইহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—ইহাতেই আমাদের প্রাণ আশায় উৎফুল্ল আনন্দে বিভোর।

এক্ষণে সকলেই ইহার কলেবর বৃদ্ধি-বিষয়ে আমাদিগকে অনুরোধ-পত্র প্রদান করিতেছেন। অনেকেই বলিতেছেন—হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের এরূপ আবশ্যকীয় পত্রিকার এত ক্ষীণ কলেবর ভাল নহে। আমরা ইহার আকার বৃদ্ধি এবং ক্ষমতানুসারে সৌষ্ঠবান্বিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক, কিন্তু ইউরোপের ভীষণ সমরে কাগজ-পত্র এরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে, পত্রিকা প্রকাশ করা এক প্রকার দায় হইয়াছে। তথাপিও গ্রাহকগণের উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য করা আবশ্যক বোধে আগামী বৈশাখ মাস হইতে আমরা "আলোচনার" কলেবর কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিব। তবে পত্রিকার খরচ সঙ্কুলানের জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা স্থলে ২৲ টাকা না করিলে পত্রিকা পরিচালন অসম্ভব। আমরা আশা করি, "আলোচনার" সহৃদয় গ্রাহকবর্গ আমাদের এই মতের অনুকূলে পত্র লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আর্য্যজাতির গার্হস্থ্যাশ্রম।

অবিদ্যাদি পঞ্চ প্রকার ক্লেশ, পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্ম, কর্ম্মানুরূপ ফল এবং কর্ম্মের সংস্কার-সমূহে উপলিপ্ত অন্তঃকরণ লইয়া জীব এ সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। ভগবান পতঞ্জলি সংসার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তস্য হেতুরবিদ্যা" অর্থাৎ অবিদ্যাই সংসারের মূল কারণ। অবিদ্যা কি? দ্রষ্টা—পুরুষ এবং দৃশ্য—প্রকৃতির পরস্পরের মধ্যে, বিবেকের অভাব হেতু পরস্পরের উপর পরস্পরের অধ্যাসের প্রতীতিই অবিদ্যা, মায়া বা ভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এই অবিদ্যা প্রভাবে জীব আত্মস্বরূপ অবধারণে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যা কৃত কর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনি লাভ করতঃ সংসার-স্রোতে নিরন্তর ভাসমান হই-তেছে। জীবের আত্মস্বরূপ কি? "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।" অর্থাৎ

সবিনয় নিবেদন—আগামী বৈশাখ মাসে "আলোচনার" বিংশতি বর্ষ আরম্ভ হইবে। আমাদের দীন তপস্যার ফলে পত্রিকাখানি এই সুদীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছে দেখিয়া এবং তাহা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিশেষ উপকারী জানিয়া আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিতেছেন এবং ইহার কলেবর কিছু বর্দ্ধিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের এই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ কথনই উপেক্ষা করিতে পারি না, কিন্তু আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে পত্রিকা পরিচালন করাই একপ্রকার দায় হইয়াছে। কারণ ইউরোপের দারুণ যুদ্ধে কাগজের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়াছে। যে কাগজ প্রতি রিম ৩৲টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই কাগজ প্রতি রিম ৫।৶০ ক্রয় করিতে হইতেছে, বাজারে কাগজের Demand বৃদ্ধি হওয়ায় প্রত্যহই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কালীরও মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ছাপার মূল্যও দ্বিগুণ হইয়াছে। গ্রাহকগণের নিকট টাকা ঠিক সময়ে আদায় হয় না, নূতন গ্রাহকও তাদৃশ বাড়িতেছে না, এক্ষেত্রে পত্রিকা-পরিচালন যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা গ্রাহকগণকে বুঝাইতে হইবে না। তথাপি আমরা তাঁহাদের কৃপানুরুদ্ধ হইয়া এক ফর্ম্মা অর্থাৎ ৮ পেজ বর্দ্ধিত করিলাম। অর্থাৎ "আলোচনা" প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইবে। তবে আমাদের এই বৎসর ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য গ্রাহকগণের কৃপাভিক্ষা করিয়া ইহার ১।০ টাকা বার্ষিক মূল্য স্থলে সামান্য বর্দ্ধিত করিয়া ২৲টাকা করিলাম, যাঁহারা "আলোচনার" উন্নতি দেখিয়া সুখবোধ করেন, যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া মা ভারতীর আশীর্ব্বাদলাভ করিয়াছেন—তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবেন না। যাঁহাদের কৃপায় "আলোচনা"র এই উন্নতি—আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আমরা ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিব। বলা বাহুল্য যে আমরা ইহাকে সাধ্যানুসারে ছবি, ছাপা, কাগজ ও প্রবন্ধ-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটী করিব না। গ্রাহক মহোদয়গণ যেন আমাদের ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া এই সৎকার্য্যে সহায় হন ও আপন আপন বন্ধুবর্গকে ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়া ক্ষীণ-কলেবরা আলোচনাকে কৃতার্থ করেন। ইতি— কার্য্যাধ্যক্ষ।

জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়। জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যা বা মায়া জীবের অন্তঃকরণে বিশেষ বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া এক পদার্থকে নানাপ্রকার ভাবে উপলব্ধি করিয়া এক ভ্রমের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই ভ্রমই জগৎ-কারণ। আবার অবিদ্যাদি পঞ্চপ্রকার ক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মজনিত সংস্কার-সমূহের আধার হইল জীবের অন্তঃকরণ বা চিত্ত। সুতরাং বলিতে হইবে জীবের চিত্তই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। শাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন যথা—

"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।

মনই মানবের সংসার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। যে মন সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত তাহা বন্ধের এবং বিষয় হইতে বিচিন্ত মনই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব জীবের মনই জীবকে সংসার-নরকে নিপাতিত করিয়াছে, মনই জীবকে স্বর্গসুখ প্রদান করিতেছে, আবার মনই জীবকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু মোক্ষের দিকে লক্ষ্য কয়জনের? তাই উদ্ধব শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—

"বদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাং।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং স্বখরাজবৎ॥

হে ভগবান্! যদিও অনেক লোক ভোগাস্পদ বিষয় সম্ভোগকে দুঃখের পরম নিদান বলিয়া বিশেষরূপে অবগত আছে তথাপি নিজের পরিণামের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট কুক্কুর, গর্দ্দভ ও অজের ন্যায় বিষয়-রসেই পুনঃপুনঃ আসক্ত হয় দেখিতে পাই। উদ্ধবের বাক্য শ্রবণে ভগবান বলিলেন :—

"অহমিত্য ন্যথা বুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসপতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ॥
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
তত কামো গুণ ধ্যানাদ্দুঃসহ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতে॥"

ভাগবৎ—১১।১৩।৯-১০

হে উদ্ধব! বিচারবিহীন প্রমত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে (চিত্তে) "আমি" বলিয়া একটা মিথ্যা ভ্রম বুদ্ধির উদয় হয়, সেই ভ্রমবুদ্ধি "আমি" হইতে সত্ত্ব প্রধান মনের অভিমুখে দুঃখের কারণ রজোগুণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে আবির্ভূত করিয়া ফেলে। অতএব অবিদ্যা প্রভাবে বিমোহিত চিত্ত তাদৃশ ব্যক্তির রজঃপ্রধান মনোমধ্যে "এই আমার ভোগ্য" বলিয়া ভোগ্য বিষয়ক বৃত্তির "অহংজ্ঞানের" উদয় হয়, সুতরাং পরক্ষণে বিষয় চিন্তার দুঃসহ ভোগাভিলাষে প্রবৃত্তি জন্মে।

সুতরাং জীবের এই "অহংজ্ঞানই" সংসার-বন্ধনের মূল কারণ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ পরমার্থতঃ মিথ্যা, মনোকল্পিত মাত্র হইলেও অহংজ্ঞান প্রভাবে জীব সেই সমস্ত মিথ্যাভুত পদার্থকে সত্যবৎ জানে তাহাতেই অভিভূত হইয়া পরমার্থতঃ সত্য বস্তুর দিকে একেবারেই লক্ষ্যশূন্য হওতঃ নিরন্তর অবশভাবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে। কি উপায়ে জীবের এই অহংজ্ঞানের

নাশ হইতে পারে? শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণং যচ্ছেন্দ্রিয়াণিচ।
আত্মা ন মাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥
যো বৈ বাঙমনসী সম্যগ সংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যাম ঘটাম্বুবৎ॥
তস্মাদ্বচোমনঃ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎ পরায়ণ
মদ্ভক্তি যুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥

ভাগবৎ—১১।১৭।৪১৪৩।

বিবেক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বাক্য, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও চিত্তকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর। ইহাদিগের গতিকে রোধ করিতে পারিলে পুনরায় আর সংসার পথে পরিভ্রমণ করিতে হইবে না। যে যতি চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়-সম্ভোগ হইতে নিরস্ত না করেন, তাহার কঠোর সাধ্য চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত এবং দানাদি পুণ্যকার্য্য সমূহ আমঘটস্থ সলিলের ন্যায় অজ্ঞাতসারে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমার উপর নির্ভর দিয়া ভক্তিসহকারে ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করা অবশ্য বিধেয়। তাহা হইলে মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সংসারোত্তরণ অবশ্য ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

এই শাস্ত্রবাক্যগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ সাধন করিতে পারিলে অহংজ্ঞানের নাশ অবশ্য হইবে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাও জীবের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। সেজন্য বিশেষ সাধনা আবশ্যক। কোন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করিতে পারিলে জীবের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া "অহংজ্ঞানের নাশ হওয়া সম্ভব? শাস্ত্র বলিতেছেন—"স্বয়ং ভগবান বেদরূপে আবির্ভূত হইয়া যে চতুরাশ্রমের বিধান করিয়াছেন, সেই সেই আশ্রম বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের "অহংজ্ঞান" বিদূরীত হইবে। এবং আত্ম-স্বরূপ অবধারণে সমর্থ হইয়া দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ভগবান বলিলেন—

"স এষ জীবো বিবর প্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ
গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরোবর্ণ
ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥

আমি জীবের দেহ বিবরে অলক্ষ্যভাবে অবস্থান করতঃ অপরোক্ষভাবে এবং পরমেশ্বর রূপে জীবকে জীবিত রাখি। নাদ বিশিষ্ট প্রাণবায়ু যোগে আধার চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনোগ্রাহ্য সূক্ষ্মরূপ অবলম্বনে প্রথম হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রা পরে উদাত্তাদিস্বর এবং অবশেষে অকারাদি বর্ণরূপে ও স্থূল বেদরূপে আমিই পরিণত হই।

যথানলঃ খেহনিল বন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্য
ভিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতোহহবিষা সমেধতে তথৈব ব্যক্তি
রিয়ং হি বাণী॥

অনল যেমন সামান্যাকাশে অব্যক্ত উষ্মরূপেই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ-যোগে কাষ্ঠ মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ পূর্ব্বক বায়ুর সাহায্যে প্রকৃষ্ট রূপে পরিণত হইয়া ঘৃতাদি সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বেদরূপা বাণী আমার স্বরূপের অভিব্যক্তি জানিবে।

ত্রেতা যুগে মহাভাগ প্রাণার্থে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূতস্যা অহমাসং ত্রিবিন্মখ ॥

হে মহাভাগ! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিরাট-রূপী মদীয় হৃদয়-পদ্মে প্রাণশক্তি হইতে ঋগ, যজুঃ ও সাম লক্ষণ অবয়বত্রয় বিশিষ্ট মূল বিদ্যা বেদ বিনির্গত হয়। এবং সেই ত্রয়ী বেদ হইতে হোতা, অধ্বর্য্য, উদ্গাত্র এইরূপ ত্রয়বিশিষ্ট যজ্ঞরূপে আমিই আত্মপ্রকাশ করিলাম।

"গৃহাশ্রমা জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদোমম্।
বক্ষস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাস শিরসিস্থিতঃ ॥
ভাগবৎ—১১৷১২, অঃ ১৭।

আমার বিরাট মূর্ত্তির জঙ্ঘাদেশ হইতে—গৃহস্থাশ্রম, বক্ষের নিম্নভাগ হৃদয় হইতে—ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে—বাণপ্রস্থ এবং শীর্ষস্থান হইতে—সন্ন্যাসাশ্রমের উদয় হইয়াছে। অতএব অপৌরুষেয় বেদ-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবের চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং "অহংজ্ঞান" নাশের প্রকৃষ্ট উপায়। এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম। যথা—

"সর্ব্বেষামপিচৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতেশ্রেষ্ঠঃ স ত্রিনেতাম্ বিভর্ত্তি হি ॥
যথা নদীনদাসর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তিসংস্থিতিম্ ॥"

এই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় মধ্যে বেদ এবং স্মৃতি বিধানানুযায়ী যে গৃহস্থাশ্রমী, তাঁহাকে ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, তিনিই অপর তিন আশ্রমের তারক—পোষক। যেমন নদ-নদী সমুদয় সাগরে যাইয়া স্থিতিলাভ করে, তদ্রূপ অপরাপর আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে। (মনু—৬ষ্ঠ. ৮৯-৯০)

অতএব আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কেবলমাত্র এই গার্হস্থাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই জীব, অমৃত স্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারে। অপরাশ্রমবিহিত কর্ম্মের কোন প্রয়োজনই হয় না; কিন্তু এই গার্হস্থাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম হইলেও বড়ই কঠোর আশ্রম। কারণ, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে এই আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান যদি না হয়, তাহা হইলে এই গার্হস্থাশ্রম আবার পাশবাশ্রমে পরিণত হইবে এবং অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া নিরয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত হওয়ত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। পুরাকালে দ্বিজাতিগণ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া, পরে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। শাস্ত্রোক্ত গার্হস্থাশ্রম বলিলে যাহা বুঝায়, আজকাল গৃহস্থগণ তাহা ধারণাও করিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা পশুবৎ আহার-বিহারই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে। পাশব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যেই যে শাস্ত্র গার্হস্থাশ্রমের বিধান করিয়াছেন, একথা কয়জনে বুঝেন? ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য, পরস্বাপহারী ও স্বার্থপর হওয়া গার্হস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। গৃহাশ্রমই জীবের পরীক্ষার স্থল। বিশেষতঃ

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সাধক যে অনুপম জ্ঞানলাভ করা যায়—গার্হস্থাশ্রমেই তাহার সম্যক্ অনুশীলন হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে গার্হস্থ-ধর্ম্ম সম্পন্ন করিবার যে সকল বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকলের চরম লক্ষ্য হইল—মনোনিবৃত্তি,বাসনাক্ষয় এবং অহংজ্ঞানের নাশ। গার্হস্থাশ্রমের এই মহৎ উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়া বিলাস ও ভোগ-লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই উশৃঙ্খল পুরুষকার অবলম্বন করতঃ অহংজ্ঞানেরই পরিপুষ্টিসাধন করিতেছি।

অনেকে বলিয়া থাকেন—"আজিকার এই ঘোর অন্ন-সঙ্কটের দিনে আর্য্যশাস্ত্র-বিধানানুসারে গার্হস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এ ঘোর অন্ন-সঙ্কট আসিল কে? তোমার ঘোর বিলাসিতাই কি এই ঘোর অন্ন-সঙ্কটের কারণ নহে? যাহা হউক, আর্য্যশাস্ত্র এ সম্বন্ধে অতি সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন,--

"বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভি জনস্য চ।
বেষবাগ বুদ্ধিসারূপ্যামাচরণ বিচরেহিদ॥

মনু—৪র্থ—১৮।

আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ, যেপ্রকার বিদ্যাধ্যায়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা বেশ, ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ অবস্থা—তিনি সেইরূপই চলিবেন। অবস্থার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিতে আর্য্যশাস্ত্র উপদেশ দেন না। আর্য্যজাতির গার্হস্থাশ্রমের শাস্ত্রোক্ত প্রধান কর্ম্ম পঞ্চ-যজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ। বেদধ্যায়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণকে, শ্রদ্ধারূপ শ্রা দ্ধদ্বারা পিতৃলোককে,স্বাহারূপ হোম দ্বারা দেবগণকে, বলি দ্বারা ভূতগণকে, এবং অন্নপানাদিদ্বারা মনুষ্যগণকে আমারই (ভগবানের) স্বরূপ জ্ঞানে নিত্য অর্চ্চনা করিতে হইবে। পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে গেলে অর্থের আবশ্যক। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"আমৃত্যু শ্রীয়মাকাঙ্ক্ষ" অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থোপার্জ্জন করিবে। কিন্তু ঃ—

"যদৃচ্ছয়ো পপনেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনা পীড়য়ন্ ভত্যান্যো যেনৈবাহরেৎ ক্রতম্ ॥৪৪
কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যাপি।
বিপশ্চিমশ্বরং পশ্যেদ দৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥৪৫

ভাগবৎ—১৭ অঃ—১১।

কোন প্রকার অভিসন্ধি বা উদ্যম ব্যতীত নিজের বৃত্তি দ্বারা যে ধন সংগ্রহ করা যায়—তদ্বারা পোষ্যবর্গের উপযুক্ত ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ পূর্ব্বক উদ্বর্ত্ত ধন দ্বারা যজ্ঞ করিবে। কিন্তু যজ্ঞ করিবার জন্য ধন সঞ্চয়ের উদ্দেশে পোষ্যবর্গকে জীবিকা-ক্লেশ দেওয়া না হয়। আবার পুত্রকলত্রাদিতে পরিবেষ্টিত বলিয়াই যে অনন্য মনে তাহাদের প্রতিই আসক্ত হইয়া পরমার্থ চিন্তনে উদাসীন হইবেন—তাহাও নহে; স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখকেও ঐহিকের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতত বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।

তাহার পর, অতিথি-সৎকার গৃহাশ্রমীর প্রধান কার্য্য। কিন্তু আজকালকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অতিথিসেবা এবং মুষ্টিভিক্ষাদি দানের বড়ই বিরোধী। তাহাদের মত এই সমস্ত কার্য্য

জাতিকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য এসব কথা পাশ্চাত্য জাতিদিগেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। এ সম্বন্ধে আর্য্য-শাস্ত্রের ব্যবস্থা এইরূপ :—

"প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খপণ্ডিত এব বা।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথি স্বর্গসংক্রমঃ॥
দূরাধ্বানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেব উপস্থিতম।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগত॥
ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায ব্রতানিচ।
হৃদয়ং কাপয়েৎ তস্মিন্ সর্ব্বদেব ময়োহিস॥
নৈকগ্রামীনমতিথিং সঙ্গি মিকং তথা।
অনিত্য হ্যাগতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥

পরাশরসংহিতা—১।অঃ৩৯।৪২।

প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি। এবং তৎসেবায় স্বর্গ লাভ হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি যদি বৈশ্বদেবের সময়ে উপস্থিত হয়, তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। অতিথির গোত্র, চরণ স্বাধ্যায়, ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে। কারণ অতিথি সর্ব্ব দেবতাময়। সকুটুম্ব অথবা কার্য্য সাধনার্থ আগত এবং একগ্রামবাসী অতিথি নহেন।

কুটুম্ব, একগ্রামবাসী, অথবা কার্য্য সাধনার্থ আগত ব্যক্তিদিগকে "অতিথি নহে" বলায় কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে তাহারা গৃহাগত হইলে অন্নদানাদি দ্বারা তাহাদের সেবা করা উচিত নহে। তাঁহারা কেবলমাত্র "অতিথি পদ বাচ্য" নহেন, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ। কুটুম্বাদিগণ গৃহাগত হইলে তাঁহাদিগকে যদি সাদর আহ্বান ও সেবাদি না করা যায়, তাহা হইলে পাপস্পর্শ হইবে, কিন্তু যথোচিত সৎকার করিলে পুণ্য হইবে না। পরন্তু অতিথিসৎকার পুণ্যার্হ।

কুটুম্বাদিগণ গৃহাগত হইলে তাহাদিগকে যথোচিত সৎকার করা যে কর্ত্তব্য একথা শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

"ইতরানপি সখ্যাদিনাং সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্।
প্রকৃত্যান্নং যথা শক্তি ভোজয়েচ সহ ভার্য্যায়া॥"

মনু ৩য় অঃ।

সখা, সহাধ্যায়ী, কুটুম্বাদি যদি প্রণয় লাভার্থ গৃহে উপস্থিত হন, যথাশক্তি তাহাদিগকে ভার্য্যার সহিত সৎকার করিবে।

সুতরাং কুটুম্বাদিগণ অতিথি মধ্যে গণ্য না হইলেও অতিথিবৎ সৎকার পাইবার যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর শাস্ত্র বলিতেছেন :—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখ জীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষস্বাদঃ স ধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ॥
ভৃত্যানামুপরোধেন যৎকরত্যৌর্দ্ধদেহিকম।
তদ্ভবত্য সুখোদকং জীবতশ্চ মৃতশ্চচ॥

মনু ১১ অঃ ৯।১০।

নিজের পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে অথচ পরকে দান করিবার বেলা শক্তির ত্রুটী নাই, তাহার সেই দান-ধর্ম্ম, ধর্ম্মের ছায়ামাত্র, ইহা আপাত মধুর বটে, কিন্তু পরিণাম বিষময়। ভরণীয়দিগকে বঞ্চিত করিয়া যিনি পারলৌকিক ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যোগদান করেন—তাহার অশুভ পরিণাম,

জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও ভোগ করেন।

পাঠক মহাশয়! ভগবান মনুর এই বাক্যটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করুন। এবং আর্য্য-ঋষিদিগের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কতদূর প্রখর ছিল তাহাও বিচার করুন। আজকাল আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর কথা ছাড়িয়া দেহ—বৃদ্ধ পিতা-মাতারও যথোচিত সেবা শুশ্রূষা হয় না, অথচ পরকে দান করিতে আমরা মুক্তহস্ত, এবং সেই সমস্ত দানের বিষয় সংবাদ পত্রাদিতে বিঘোষিত হইলে পাঠ করিতে করিতে আমরা কতই না আত্মতৃপ্তি উপভোগ করি।

আর্য্যশাস্ত্র অতি দরিদ্রের পক্ষেও অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার করিবার বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ঃ—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতন্যাপি সতাং গৃহেনোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

মনু—৩ অ ১০১

অতি দরিদ্র হইলেও অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বসিবার জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জল ও চতুর্থতঃ স্নিগ্ধকর প্রিয়বচন—এ সকলের অভাব সজ্জনের গৃহে কখনই হইতে পারে না।

হায়! কালবশেই হউক, আর শিক্ষার দোষেই হউক, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বসিবার জন্য আর আমরা ভূমি পর্য্যন্তও দেখাইয়া দিই না। তৃণগুলির মূল্যত এখন অত্যাধিক দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়বচন বলিলে পাছে অভ্যাগতব্যক্তি আপনা হইতেই ভূমিতে উপবেশন করেন, সেই ভয়ে এখন আগমন মাত্রেই "অর্দ্ধচন্দ্রের" ব্যবস্থাই হইয়া থাকে।

অলস, মাত্রভিক্ষোপজীবি, পরপ্রীড়কও যে আর্য্য-সমাজে নাই এমন কথা আমরা বলি না। এইরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গৃহস্থকে অনেক সময়ে যে অত্যন্ত উত্যক্ত হইতে হয়, তাহাও সত্য। পরন্তু এরূপ ব্যক্তি যে গৃহস্থের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, আর্য্য-শাস্ত্র সে কথাও বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"অনৃতাহ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজা।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্ত প্রদোহিসঃ॥

পরাশরসংহিতা—১ অঃ ৫৬।

যেস্থানে দ্বিজগণ মিথ্যাবাদী, পাঠাভ্যাসহীন এবং কেবলমাত্র ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করে রাজা সেই গ্রামবাসীগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন কারণ তাহারা চোরকেই প্রতিপালন করিতেছে।

উপরোক্ত শাস্ত্র বাক্যগুলি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত গার্হস্থাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কি ধনী, কি নির্ধন, কি মধ্যবৃত্ত, সকল শ্রেণীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ অবস্থা, তিনি তদনুরূপই অনুষ্ঠান করিবেন। আর্য্যশাস্ত্র এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, কিন্তু তত্রাচ আজকাল "অন্নসঙ্কটের" দোহাই দিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে আমরা গার্হস্থধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ। কারণ আর কিছুই নহে, আমাদের আর সে প্রবৃত্তি নাই, এখন ভোগ-লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করাই গার্হস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য বলিয়াই বুঝিয়াছি। হায়! মানবের কি ভ্রান্তি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রলয় তত্ত্ব।

উপনিষদের আলোচনার ফলে জানিতে পারা যায় যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই "আমি বহু হইব" এই প্রকার সংকল্প পূর্ব্বক আপনাকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মা হইতে প্রকাশরূপ জন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহার একটি মানস কল্পিত আকার ফুটিয়া উঠে। চিত্র অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ একটি আকার চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। এই জায়মান কল্পিত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই ব্রহ্ম দর্শন রূপ সংকল্প করেন।" ইহাই স ঐক্ষত, ইমাল্লোকান সৃজত ইতি।" সৃষ্টি অনাদি বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানস কল্পিত আকারটী বাস্তব আকারেরই সূক্ষ্মাবস্থা বলিতে পারা যায়। তৎপরে আমি হিরণ্যগর্ভরূপে (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নামই হিরণ্য-গর্ভ) জন্মিব, আমিই সপ্তর্ষিরূপে জন্মিব, আমই সূর্য্য মনু ইত্যাদি হইয়া জন্মিব। "অহং মনুব ভবম্" ইত্যাদি। ক্রমে বীজ হইতে বৃক্ষ তৎপরে শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প ইত্যাদি উৎপত্তির মত ক্রমে এই অসংখ্যজীব সমাকুল বৃক্ষলতাদি-ব্যাপ্ত-বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অব্যবহিত পরে জায়মান বিশ্বের দর্শন-রূপ সংকল্পের নামই সৃষ্টির ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা। এই সিসৃক্ষাই মায়া। যখন শুদ্ধসত্ত্বময়ী, ব্রহ্মাশ্রয়া, তখন মায়া আখ্যা। যখন রজস্তমোময়ী জীবাশ্রিতা, তখনই অবিদ্যা নাম। এই মায়াকে বশীভূত করিয়া মায়া সহিত হইলে মায়ারী পর-মেশ্বর। অবিদ্যা দ্বারা বশীভূত হইলেই অসংখ্য জীব। মায়া ও অবিদ্যা স্বরূপতঃ একই। মায়া সিসৃক্ষারূপা কাজেই ব্রহ্মা হইতে অনতিরিক্তা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বস্তু হইতে পারে না, কাজেই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়ার দ্বারা আবৃত্ত না হইয়াও আবৃতবৎ প্রতিভাসিত। তখন জীব অবিদ্যা দ্বারা আপনাকে সুচিরবদ্ধ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না।

সৃষ্টিই বিশ্বের প্রকাশ। প্রলয় বিশ্বের বিলীনা-বস্থা। বিশ্ব যখন স্থূল তখনই সৃষ্টি,যখন সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত, তখনই প্রলয়। কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত ইহার প্রকাশ ও অপ্রকাশ পরমেশ্বরের আয়াস সাধ্য কার্য্য নহে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত তাহার পক্ষে সহজ।

সৃষ্টির পরে এই জগৎ স্থূল প্রত্যক্ষদৃশ্য, নামরূপে অভিব্যক্ত। এই জন্যই সৃষ্টির পর এই বিশ্ব ব্যাকৃত। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ান্তে এই জগত সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য-মহত্বশূন্য, নামরূপবিহীন। এই নামরূপবিহীন অবস্থাকেই অব্যাকৃতাবস্থা বলে। তাহা হইলে এই ব্যাকৃত বিশ্বের অব্যাকৃতাবস্থায় পরিণতি লাভের নাম প্রলয়। আর অব্যাকৃত বিশ্বের ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্তির নামই সৃষ্টি। মহাপ্রলয়ান্তে এই "তদ্ধেদমব্যাকৃতমাসীৎ" বিশ্ব অব্যাকৃতভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রলয়ান্তে জগৎকার্য্য যখন সূক্ষ্ম, নামরূপবিহীন, অব্যাকৃত ছিল, তখন সূক্ষ্ম অব্যাকৃত অবস্থাকে স্থূলবিশ্বের পূর্ব্বাবস্থা বলিতে হয়। আবার ঐ অব্যাকৃতা-বস্থাকে স্থূলের কারণও বলা যাইতে পারে। বীজ—অঙ্কুরের পূর্ব্বাবস্থা অথবা অঙ্কুরের কারণ। এই উক্তি প্রকারই বলা হইয়া

থাকে। সূক্ষ্মই স্থূলে পরিণত, স্থূলই আবার সূক্ষ্মে পরিণত।

দাঁড়াইল—সূক্ষ্মই স্থূলের উপাদান কারণ। ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলা হইয়া থাকে। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর—"ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ" তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে মায়াসহিত হইয়াই উপাদান কারণ, ইহা সকলকেই বুঝিয়া রাখিতে হইবে। অতএব মায়াকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে উপাদান কারণ যখন বলা যায় না, তখন মায়াকেই বিশ্বের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিশ্বের প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মাবস্থাই মায়া বা সিসৃক্ষা। সূক্ষ্ম যদি স্থূলের উপাদান কারণ, তাহা হইলে, স্থূল—সূক্ষ্মের কার্য্য। এই জগতের বীজভূতই মায়া। বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ারই কার্য্য। বিশ্বের কারণ রূপে যেস্থলে ব্রহ্ম ব্যবস্থিত, সে স্থলে মায়াকে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রথমে ব্রহ্মরূপ পরমকারণ, মধ্যে কারণীভূতা মায়া বা শক্তি; শেষে স্থূলকার্য্য বিশ্ব। কারণই শক্তি-আকারে কিম্বা শক্তিই কার্য্যাকারে, অতএব কার্য্যের প্রত্যক্ষহেতু শক্তি কিম্বা [illegible] কারণ। এই চরাচর বিশ্বের প্রলয় [illegible] পরিণতি বুঝিতে হইবে। জল [illegible] ধারণ করে, দৃশ্যমান [illegible] বিহীন. অব্যাকৃতা [illegible]

[illegible] বিশ্ব-[illegible] মূল-[illegible] মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মের ধাটী সিসৃক্ষাকারে বর্ত্তমান রহে; এই সিসৃক্ষারূপা মায়া যখন সূক্ষ্মকার্য্যাকারেও দৃশ্যমান হয় না, তখনই ব্রহ্মে মিলাইয়া যায়। মহানদী যেমন সহস্র সহস্র নদীকে আপনার বিশাল গর্ভে মিলাইয়া সাগরে মিলিত হয়, এই মায়াও তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ নিজের বিশাল গহ্বরে অন্তর্নিহিত করিয়া নিজেও ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়। এই মায়ার মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্ব সর্ব্বদাই বিরাজমান বলিয়া নাম—বিশ্বাত্মিকা। সকল বিশ্বের কারণ বলিয়া বীজভূতা। জীবগণের অন্তঃকরণাবচ্ছিন্না মলিনা অবিদ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক অদৃষ্ট, জন্ম জন্ম পরিচিত বাসনা পর্য্যন্ত মায়াতে বিলীন হয়। তখন এই মায়াই যেন বিশাল মানচিত্র। সৃষ্টিকালে আবার এই মানচিত্র দৃশ্যমান বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সিসৃক্ষোপেত ব্রহ্ম বা মায়াবী পরমেশ্বরের প্রথম সৃষ্টি—আকাশ। "আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী সমজায়ত।" আকাশের স্পন্দনে বায়ু, বায়ুর ঘর্ষণে তেজ, তেজের সমতায় জল, জল হইতে পৃথিবী—এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। সৃষ্টিব্যাপারে কোন্‌টী প্রথম, কোন্‌টী দ্বিতীয়, ইহার সম্বন্ধে উপনিষদে এক মত দেখা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর সৃষ্টিকার্য্যের একটী ক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াও শেষ বলিয়াছেন—"সৃষ্টির ক্রমে বিরোধ থাকিলেও কারণ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই।" এই যে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বলা হইল, ইহাও প্রথম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতোৎপত্তি বুঝিতে হইবে। পরে পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত-সম্মিশ্রণ স্থূলে বর্ত্তমান

দৃশ্য পৃথিব্যাদি স্থূলভূতের উৎপত্তি।

উপনিষদে সৃষ্টি-প্রলয়-তত্ত্বই সংহিতা পুরাণের অভিমত। সংহিতা পুরাণের মধ্যে সৃষ্টি-প্রলয়ের ক্রম বিষয়ে এক মত দেখা যায় না। আমরা মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব আংশিক আলোচনা করিয়া, উপনিষদ ও সংহিতা-কথিত সৃষ্টি-প্রলয়ের ঐক্য দেখিব।

সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতা প্রাচীন এবং অধিকতরপ্রমাণযুক্ত। "মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ব্যাপক।" মনুর অর্থ বিপরীত স্মৃতি অপ্রশস্ত। "যদ্বৈ মনু রবদৎ তদ্বৈষং।" মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতিঃ ন প্রশস্যতে। প্রথমে মনু বলেন,—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।"

এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোভূত ছিল। তমোভূত কথাটীর সাধারণ অর্থ—অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকারে ঘট বিদ্যমান থাকিয়াও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরও দৃষ্ট হয় না। সৃষ্টির পূর্ব্বেও (সূক্ষ্মাকারে) বিদ্যমান বিশ্ব নাম-রূপ-বিহীন অব্যাকৃত অবস্থায় থাকায় দৃশ্যমান হয় না। থাকিয়াও না থাকারই মত। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অভাব কিম্বা শূন্যাকারে অবস্থিতি প্রমাণিত না হইয়া বরং "আসীৎ" "ছিল" ইহাই প্রমাণিত হয়। তবে নামরূপে অনভিব্যক্ত বলিয়া অপ্রত্যক্ষ, অদৃশ্য। স্থূল জগৎ যখন অনামরূপ সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল, তখন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতা হইতে পারে না। তমঃ কথাটির অর্থ প্রকৃতি। প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকার নাম তমোভূত। স্বীয় মূলপ্রকৃতিতে অবস্থিত প্রকৃতি লীন ভাবপদার্থগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটের মত থাকিয়াও অদৃশ্যবৎ প্রতীত। এই তমঃ শব্দ বাচ্য প্রকৃতি তমই অন্ধকারের মত। তমোভূতা অন্ধকারস্বভাবা, অদর্শনস্বভাবা প্রকৃতি যে তমঃ শব্দের অর্থ, ইহা বহু স্থলে অভিহিত আছে।

তাহার পরই "অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ" "আমি বহু হইব" এই প্রকারে ঈক্ষণরূপ সংকল্প পূর্ব্বক নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টি কামনা করিয়া পরমেশ্বর প্রথম অপ্ সৃষ্টি করিলেন। অপ্ শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। পঞ্চীকৃত হইলেই স্থূলভূত। অপঞ্চীকৃত ভূতকেই সূক্ষ্মভূত বলা হয়। উপনিষদে অপ্ অর্থে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই বুঝিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যে অপ্ শব্দের অর্থই যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তাহা শ্রুতি ও যুক্তি সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। অপ্ শব্দের অর্থ জল হইলে উপনিষদের অর্থ-সামঞ্জস্য থাকে না। মনুও এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকেই উপনিষৎ অনুসরণ করিয়া অপ্ বলিয়াছেন। অপ্ শব্দের জল অর্থ করিলে মনুসংহিতার মধ্যে বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে, উপনিষদের সহিত একমত থাকে না।

তৈত্তিরীয়কে প্রথম আকাশ সৃষ্টি, ছান্দোগ্যে আকাশ বায়ুকে অন্তর্ভূত করিয়া তেজই প্রথম সৃষ্টি। মনু যে সম্পূর্ণ উপনিষদের বিরুদ্ধে যাইবেন—সম্ভবও নহে। প্রথমেই মনু "অন্ধকারের মত অদর্শন স্বভাবা প্রকৃতিতে এই জগৎ বিলীন ছিল" ইহা বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সূক্ষ্মপ্রকৃতিরই প্রথম অভিব্যক্তি রূপে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য। স্থূল জলময় সাগর সৃষ্টির কথা মনু পরে বলিয়াছেন।

ছেন, এইজন্য অপ্ শব্দে স্থূল জল অর্থ হইতেই পারে না। ঐ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত জল প্রধান বলিয়া তরল। আকার ঘনীভূত, জলের মত দ্রব বলিয়া অপ্ শব্দ বাচ্য। জলে পৃথিবী মিলিলে ঘন জলাকার ধারণ করিবে। তাহাতেই তেজ পড়িলে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইবে মাত্র। আর বায়ুযোগে তাহার চাঞ্চল্য দেখা যাইবে। তবেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত যে ঘনীভূত তরল দ্রবাকার অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রলয়ান্তে পাঞ্চভৌতিক জগৎ আপনার স্থূল আকার ত্যাগ করে, ঐ অবস্থার নাম মূলপ্রকৃতি, শক্তি, পঞ্চতন্মাত্র, পরমাণু যাহা হউক না কেন, উহা যে স্থূলেরই সূক্ষ্ম পরিণতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সূক্ষ্ম পরিণতির প্রথম অভিব্যক্ত অবস্থায় অপ্ বা সূক্ষ্মভূত নাম ধারণ করে। একই মায়া বিবর্ত্তিতা হইয়া কখন অবিদ্যা, কখন মূলপ্রকৃতি, কখন সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, কখন বা দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের আকার ধারণ করে। আবার মায়া সৃজনেচ্ছা মাত্র। ইচ্ছা ইচ্ছাময় হইতে স্বতন্ত্র নহে, কাজেই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র।

মনুসংহিতা স্মৃতি। শ্রুতিমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রমাণ। শ্রুতি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া প্রমাণ হয় বলিয়া স্মৃতি স্বতঃপ্রমাণ নহে। শ্রুতিপ্রমাণ সাপেক্ষ বলিয়াই স্মৃতি অনুমানের মত প্রমাণ। শ্রুতি অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষের মত প্রমাণ। অনুমান একাংশে প্রত্যক্ষকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। মনুসংহিতা অবিকৃতর শ্রুত্যনুগামী বলিয়াই স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন লাভ করিয়াছে। মনু স্মৃতি কখনই শ্রুতিবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন না। যে স্থানে শ্রুতি অপ্রাপ্য, বিলুপ্ত, অর্থবোধে সন্দিগ্ধ এবং বিরুদ্ধ, তথায় স্মৃতি দেখিয়া ঐ শ্রুতির ইয়ত্তা করিতে হয়; সন্দেহ ও বিরোধের ভঞ্জন করিতে হয়। মনুসংহিতার অপরাপর স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান নাই বলিয়া বিরত হইলাম।

এইবার পুরাণ আলোচনা করা যাউক। শ্রুতিবিহিত ও স্মৃত্যুক্ত মতগুলি আখ্যায়িকা দ্বারা বা অপরাপর উপায়ে সরল, সরস, উপভোগ্য করিয়া দাঁড় করাণই পুরাণের কার্য্য।

কবোত্যেবং বিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃ পুনঃ।
সিসৃক্ষাশক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তি প্রচোদিতঃ॥

যদৃচ্ছাগৃহীত।

পুরাণ শ্লোকের সৃষ্টি করিলেই উপনিষদ ও স্মৃতির মতই যে ইহার অভিমত, তাহা বুঝা যায়। এই শ্লোকে সেই উপনিষদ অনাদি সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যায় "সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাহাতেও এই অনাদি সৃষ্টির কথা। আর সিসৃক্ষা সৃজনেচ্ছা যে মায়া, তাহাও স্বীকার করা হইল। মায়াই প্রকৃতি পৌরাণিক সৃষ্টি উপনিষদেরই অনুরূপ। উপনিষদের ক্রমে যেমন বিরোধ, পুরাণে সেই বিরোধ। পুরাণে প্রলয় চতুর্ব্বিধ, আমাদের প্রলয়-তত্ত্ব মহাপ্রলয়-তত্ত্ব; এইজন্য আমরা প্রলয় শব্দের ব্যবহার মহাপ্রলয় অর্থেই করিয়া আসিয়াছি, করিবও।

পুরাণে অনন্ত সলিলশয়নে ভগবান নারায়ণ শায়িত। বটপত্র শয্যাস্থানীয়। ভগবান

মায়াশূন্য নির্ব্বিকার যোগনিদ্রায় সুপ্ত। "সলিলের উপর শয়ন" আমাদের কল্পনায় খাপ খায় না বলিয়াই বটপত্রের আবির্ভাব, তাহা নহে। পুরাণকার সাধারণ দুর্বোধ্য সূক্ষ্ম সত্যটিকে স্থূল আকার দান করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সূক্ষ্ম সত্য নির্ণয়ই যেখানে উদ্দেশ্য, আর সে সত্য যে স্থানে দুর্ব্বোধ্য, তথায় স্থূল সত্য আকার অবলম্বন ব্যতীত উপায় কি? আর স্থূলসত্য যদি ঠিক সত্যই না হয়, তাহা হইলেও সত্য নির্ণয়ার্থ অবলম্বনীয় বলিয়া মিথ্যা বলা যাইতে পারে না।

মহাপ্রলয়ান্তে যাবতীয় বিশ্বই জলময়। সেই জলময় মহাসাগরে শয়ান জগৎপতি নারায়ণ। এই সলিলের নামই কারণ-বারি বা কারণার্ণব। সাধারণ স্থূল জল কার্য্য। কার্য্য স্থূল জল কারণীভূত জল নহে। স্থূল জলকে কারণ-বারি বলাই যায় না। তবে সূক্ষ্ম জলই কারণ-বারি, ইহা কতকটা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু উপনিষৎ স্মৃতি ও পুরাণের একবাক্যতা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ অপ্ শব্দ বাচ্য সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই পুরাণের কারণ-বারি বা কারণার্ণব। স্থূল ভূতের কারণই সূক্ষ্মভূত বা সূক্ষ্মভূতাত্মিকা প্রকৃতি বা শক্তি। কারণ-বারি জল ও অপর ভূতেরও কারণ। ইহা জলপ্রধান বলিয়া দ্রবাকার তরল, আর জলেরও কারণ বলিয়া কারণ-বারি আখ্যা।

সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মে বিলীন। তথাপি ব্রহ্ম এই প্রকৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পৃষ্ট নন। সাপের মস্তকোষে বিষ থাকে, কিন্তু সে বিষে সাপের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ মায়া বা সূক্ষ্মভূতাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মে বিদ্যমানা থাকিয়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, মলিন বা আচ্ছন্ন রাখে না। সূক্ষ্মভূতাত্মক কারণ-বারির উপর ভগবান শয়ান; এস্থলে ঐ স্পর্শ বাস্তব নহে, কারণ-বারির সহিত আধার আধেয় ভাব নাই, তজ্জন্য বটপত্রকে শয্যা-স্থানীয় রূপে আনয়ন করা হইয়াছে। সান্ত সসীম কারণ-বারি অনন্ত অসীম শ্রীভগবানের আধার হইতে পারে না। কার্য্যগত মালিন্য ভগবানে স্পর্শ করে না। মহাপ্রলয়ান্তে তিনি গুণরহিত মায়াতীত, নির্লিপ্ত, উদাসীন ও নির্ব্বিকার। কারণ-বারির সহিত ঐ নির্লেপ ভাব বোঝান উদ্দেশ্যেই বটপত্র শয্যা। আর আমরা শ্রীভগবানকে আত্মমত দেখি, ভাবি, ব্যবহার করি। আমরা সলিলে ভাসিতে পারি না, একটী অবলম্বন পাইলে পারি। শ্রীভগবানও বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সলিল-শয্যায় শয়ান।

বলিয়াছি, পুরাণে স্থূলবিশ্বই সূক্ষ্মতম হইয়া স্বপ্রকৃতি রূপ কারণ-বারি আখ্যা পাইয়াছে। এই কারণ-বারি জড়-সংঘাত, তাহার মধ্যে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যই নারায়ণ। সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ঐ কারণ-বারির মধ্যে অবস্থিত। আবার সৃষ্টি সময়ে ঐ জগৎপ্রপঞ্চ বাহির হইয়া থাকে। মায়া সমস্ত বিশ্বকে আপনাতে বিলীন করিয়া যখন ভগবানে মেশে, তখন বিশ্ববাসী জীব আদৌ বুঝিতে পারে না, তাহারা ব্রহ্মে মিশিয়াছে। তাহারা মায়ার মধ্যেই বিদ্যমান ভাবে। কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া, অবগাহন জলে

রাখিয়া দাও; তৎপরে সেই বদ্ধমুখ কলসী সাগরে, গঙ্গায় কিম্বা সরোবরে যেখানেই ছাড়িয়া দাও না, যে লবণাক্ত জল, তাহাই থাকিবে।

এইরূপ সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে যে সূক্ষ্ম আবরণের মত একটী রূপক কল্পনা, আখ্যায়িকা পুরাণে দৃষ্ট হয়, তাহার উদ্দেশ্য খুব ভাল। প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধির পক্ষে ইহা অতীব উপকারক, তাহা ভারতীয় অজ্ঞ নর-নারীর ধর্ম্ম বিশ্বাস দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় সত্যের স্বাভাবিক রূপের মত রূপ নাই সত্য, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি ঐ সত্যরূপ ত দেখিতে পান না। পুরাণকার সেই রূপটিকে একটু চিত্রিত করিয়া দর্শনযোগ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ঐ সূক্ষ্ম আচ্ছাদন মাত্রের লোভে ও ঐ চিত্রিত নূতন বর্ণ-সৌন্দর্য্য-লালসায়ও যদি মানবেরা অগ্রসর হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সূক্ষ্ম আচ্ছাদনের মধ্যে সত্যের বিমল ছবি দেখিতে পাইবে, প্রকৃত রূপের বিকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। অগ্রে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম। উপনিষদের, সংহিতার ও পুরাণের দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল, তাহাতেই এতটুকু আলোচনা করা হইল, যে ইহাতে সুধিজনের আশানুরূপ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

পাপ ও অনুতাপ।

(পারস্য কবি—সাদীর ভাবানুসরণে)

কেন বৃথা ডাকাডাকি দিছে ঐ চীৎকার,
তাপ-শান্তি লাগি' দিতে কেন দরবার ?
এমন করিয়া ডাক' অন্যে নাহি শোনে,
যে শুধু জুড়া'বে জ্বালা তা'রে ডাক মনে।
ফলমাঝে বীজসম আছে অভিশাপ,
জড়িত পাপের সঙ্গে তাই অনুতাপ;
অভিশাপ কেটে গেলে অঙ্কুরিবে তরু,
আশীষের পুষ্পপুঞ্জ ঢেকে যা'বে মরু।
আগে হ'তে নিয়ন্ত্রিত সকল বিধান,
অকালে মোচন লাগি' মিছে সে সন্ধান।
রাখিও না জমা কিছু কাটাও মেয়াদ
অনুতাপে দগ্ধ কর সব অপরাধ।
বিশুদ্ধ পবিত্র হও জ্বলিয়া পুড়িয়া,
লজ্জিত হইয়া প্রভু জুড়াবেন হিয়া।

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ।

শিবরাত্রি।

নিবিড় অরণ্য প্রান্তে ক্ষুদ্র তটিনী কুলকুল রবে প্রবাহিত। তাহার হৃদয় খানি অন্ধকারের কালো ছায়ায় ক্রমশঃ ঢাকিয়া পড়িল। দিবসের বিদায় গানের অবসানে তাহার বিলাপ রাগিনী মুখরিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অধর হইতে ম্লান হাসি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এক ব্যাধ সারাদিন শীকার করিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অরণ্যের মধ্যে দিয়া ঘরে ফিরিতে ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বিল্বতরুর শিরোভাগে আশ্রয় লইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল। শেষ রাত্রিতে একটি শিশির সিক্ত বিল্বপত্র তরুতলে নিপতিত হইল।

বিল্বতরুতলে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্ত্তির শীর্ষদেশে বিল্বপত্র পতিত হইবা মাত্র ভগবান্ আশুতোষ ব্যাধের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্যাধ শিবদর্শনে মুক্ত হইয়া সাযুজ্যমোক্ষ লাভ করিল।

এ বহুকালের পুরাণ কথা। কৃষ্ণ পক্ষের বসন্ত চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিলে সাযুজ্য মোক্ষ লাভ হয়। এমন সুন্দর অনায়াস লব্ধ মোক্ষ আর কখন কিছুতে হয় না। ব্যাধ বিনা তপস্যায়, বিনা সাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

এস ভাই আজ এই পূণ্য তিথিতে শিবা-রাধনা করিয়া জীবন সার্থক করি। ভগবানের যেমন পবিত্র, সরল শুভ্র সদানন্দ মূর্ত্তি, সাধনাও সেইরূপ আড়ম্বর ও সমারোহ বিহীন। এস, একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবতার আবাহন করি। বলি—ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। ঠাকুর! তুমি অনন্ত, আমি তোমার সেবক, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি সাস্ত হইয়া যাও। মৃন্ময়লিঙ্গে প্রস্তরে, প্রতিমাদিতে,পুষ্পে, গঙ্গাজলে, বিল্বপত্রে আবির্ভূত হও। আমি একান্ত ভক্তিভরে পুষ্পা-ঞ্জলি দিয়া বলিতে থাকি—সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ। বলি :—

ওঁ নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়।"

একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি :—

অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং
ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে
ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং
কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোস্মি তস্মাৎ।"

তৎপর গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া—আবার বলি :—

"ব্রহ্মামুরারি সুরার্চ্চিত লিঙ্গং
নির্ম্মলভাষিত শোভিত লিঙ্গং
জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং
তৎ প্রণমামি সদা শিবলিঙ্গম্॥"

আমরা দরিদ্র—নিঃসহায়—নিরাশ্রয়। এস ভাই মোক্ষদাতা বিশ্বেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, আর বলিতে থাকি—ভগবান আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর কর। তাহা হইলে আমাদের প্রাণের বেদনা বৈদ্যনাথের কৃপায় একেবারে দুর হইবে।

"বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায়
কর্ণামৃতায় শশীশেখর ধারণায়।
কর্পূর কান্তিধবলায় জটাধারায়
দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।

হে শিব—হে আশুতোষ — শম্ভো — হে শঙ্কর—হে মহাদেব—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি এ সংসারে বড় জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করি-তেছি। আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। আমায় বল দাও, যাহাতে আমার চিত্তের চঞ্চলতা দুর হয়। আমি একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা তোমায় ডাকিতে পারি। হে মঙ্গলময় সর্ব্বা-ন্তর্য্যামী—ভগবান চিত্তেশ্বর। আমার মনের মলদোষ দুর করিয়া নির্ম্মল করিয়া দাও—

আবরণ দোষ শূন্য করিয়া স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করিয়া দাও,—সতত বিক্ষেপপ্রবণ অন্তঃকরণকে নিস্পন্দ, নিষ্কম্প, অচঞ্চল, স্থির, শান্ত করিয়া দাও। আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিণাম।

(ক্ষুদ্রগল্প)

উচ্ছৃঙ্খল পুত্র রমেশচন্দ্রকে বিদায় দিয়া ভবতোষ বাবু কতকটা সুস্থির হইলেও গৃহিণী রাজলক্ষ্মী পুত্রের অভাবে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। রমেশ যে তাঁহার বড় আদরের একমাত্র সন্তান। অনেক কষ্টে তাহাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মী বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজকর্ম্ম তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অভাবে ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। পুত্রকে গৃহে আনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবেন, সে সাহস তাহার ছিল না,কারণ রমেশের অপরাধ বড় গুরুতর। ভবতোষবাবুর বহু কষ্ট সঞ্চিত অর্থ শ্রীমান রমেশের উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্রমেই হীনতা প্রাপ্ত হইতেছিল।

পরিত্যক্ত রমেশ বাটি হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে তাহার উদ্দামপ্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার ইচ্ছা এখন উপযুক্ত অবসর খুঁজিয়া পাইয়াছে। মাতৃদত্ত কিছু টাকা কড়ি তাহার কাছেই ছিল, কাজেই এই পরিত্যক্ত অবস্থা ভাবিবার সময় তখন তাহার ছিল না। সে বরাবর হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া কাশীর টিকিট কিনিল এবং যথাসময়ে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতামাতার সহিত সে ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার কাশীতে আসিয়াছিল, কাজেই আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে তাহার কষ্ট হইল না।

এইবাবে রমেশ স্বাধীনভাবে নিজের কুবৃত্ত পরিচালনা করিবার স্বর্ণ সুযোগ লাভ করিল। বাটীতে থাকিতে সদাসর্ব্বদাই পিতার ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হইত কিন্তু এখানে ত আর সে ভয় নাই, কাজেই সে অবাধে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইল।

প্রথম প্রথম কাশীতে আসিয়া সে মাতাকে দু-একখানি পত্র লিখিত, মাঝে মাঝে মায়ের স্নেহ আদর মনে করিয়া মায়ের জন্য একটু কাতরও হইত। কিন্তু কুৎসিত আমোদ প্রমোদ যখন বেশ জমাট হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিল, তখন সে মাকে ভুলিল, তাঁহাকে পত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিল।

জননী রাজলক্ষ্মীর অত্যধিক আদরে রমেশ অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া সখের থিয়েটার, মদ্যপান, বারাঙ্গনা গমন ইত্যাদি পাপের নেশায় রীতিমত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। ভবতোষ বাবুর কঠোর শাসনেও তাহার কোনও উপকার হয় নাই। "আবদারে ছেলে" পিতার নিকট তাড়না পাইয়া মায়ের কাছে গিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, পিতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত এবং গৃহবহিষ্কৃত রমেশ মাতৃস্নেহের অসীম টানে পুনরায় গৃহ প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছে। সে জানিত, পিতা তাড়াইয়া দিলেও তাহার

স্নেহময়ী জননী কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিবেন না। এই স্নেহ-স্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া সে পিতার মার-পিটগুলি বেশ নির্ভাবনায় পরিপাক করিত। এইরূপে স্নেহমুগ্ধা জননীর অনাবিল আদর যত্ন পুত্রকে সংযত না করিয়া অসংযত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এবারে রাজলক্ষ্মী কিছুই করিতে পারিলেন না, কারণ ভবতোষ বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে "যদি এবারে রমেশ পুনর্বার গৃহে আসে, তাহা হইলে আমি আত্ম-হত্যা করিয়া অপমানের হাত এড়াইব।"

কাশীতে রমেশ নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদে উন্মত্ত হইয়া প্রায় ৫।৬ মাস কাটাইল, সঞ্চিত অর্থরাশি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখনও রমেশের জ্ঞান হইল না।

আজ রমেশের হাতে আর এক কপর্দ্দকও নাই কিন্তু যে প্রবৃত্তির নিকট ধনী দরিদ্র ভেদ নাই, সেই অদম্য প্রবৃত্তিকে রমেশ কিছুতেই বশে আনিতে পারিল না। রমেশের দু-একটী প্রাণের দোস্ত যখন দেখিল যে কাপ্তেন বাবু ক্রমে খালাসীতে নামিয়া আসিয়াছেন, তখন তাহারা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দু-একটা অভদ্রভাষী আওড়াইয়া সরিয়া পড়িল।

রমেশের রক্ষিত বেশ্যার নাম মতিয়া। প্রথমে হরিদাসী কিংবা তারকদাসী এই প্রকারের একটী নাম ছিল; কিন্তু রমেশবাবুর আগমনের পর হইতেই তিনি মতিয়া নামে অভিহিতা হইয়াছেন। রমেশ এই মতিয়া বিবি সাহেবার বাটিতেই থাকিত, সেই স্থানেই দিন, রাত আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইত, কিন্তু এখন আর মতিয়া তাহাকে রাখিতে চাহিল না। একদিন স্পষ্টই বলিল "রমেশ বাবু! আমার বাড়ীতে চুপ করে বসে বসে যে খাবেন, আর শুয়ে থাকবেন তা হবে না। আমরা ভাই বেশ্যার জাত—টাকা ফেলুন,থাকুন আপত্তি নাই, তবে পয়সার সঙ্গে খোঁজ নাই, অথচ যে চোখ রাঙিয়ে কথা কবেন, আর আমার রোজগারগুলি বসে বসে মদ খেয়ে উড়াবেন, তা আমি হতে দেব না। আমার কাছে ভাই সাফ কথা। যদি ভালয় ভালয় না যান ত লোক ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিব। তোমার মত আমি অনেক খরচে বাবু দেখেছি। বেশ্যাবাড়ী এসে আমোদ করা তোমাদের কাজ নয়, যাও সরে পড়।"

রমেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"কি হারাম-জাদি! আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে আমি ফকির হ'লাম, আর তুই কিনা আমায় তাড়িয়ে দিতে চাস্?"

মতিয়া। তোর যথাসর্ব্বস্ব আমায় দিয়েছিস্ কি রকম? তোর ছিল কি? তুই যে দরের বাবু তা' আমি বুঝে নিয়েছি। এখন আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবি কি না বল্? কেন অপমান হবি? আমি নেহাইত [illegible] লোকের মেয়ে তাই চুপ করে রয়েছি, অন্য কেউ হলে ঝাঁটা মেরে তাড়াত।"

রমেশ আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া বলিল "মতিয়া! এই না তুই আমায় ভালবাসিস্ [illegible] তুই যে আমায় সে দিন বলেছিলি যে [illegible] মরণে আমি তোমার, তুমি আমার [illegible] অবস্থায় রাখবে আমি [illegible]

থাকব। আমি ছেলেবেলা হ'তে ভালবাসা কা'কে বলে জানি না, আমাদের যা' পেশা তাতে ভালবাস্‌তে গেলে পেট চলা দায় হয়ে ওঠে; কিন্তু তোমায় দেখে অবধি আমি ভালবাসা কি, তা বুঝতে পেরেছি। তুমি রাত্রে ঘুমিয়ে থাক, আমি সারা রাত জেগে তোমার মুখ পানে চেয়ে থাকি।" রাক্ষসি! পিশাচীর জাত তোরা, সয়তানের ক্রীতদাসী তোরা—এমন প্রলোভনে ফেলেছিলি যে, আমি আমার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলেছিলাম। সর্ব্বনাশি! এত দিনের পর বুঝলাম—কেন লোকে তোদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, কেন তোদের ছায়া স্পর্শ করলেও লোকে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হয়।"

মতিয়া। বুকে আগুন! আমি আবার কবে এ সমস্ত কথা বলেছি? আর যদিই বা বলে থাকি ত' সে নেশার খেয়ালে। আর তুইও যে আমায় কত কি বলেছিলি। সে সমস্ত বুঝি মনে নাই? আমি ওঁর জন্য পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াব, আর উনি ঘরে বসে বসে স্ফূর্ত্তি করবেন।"

রমেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। এ রকম অপমানিত সে কখনও হয় নাই. চিরকাল পয়সার জোরে সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে। পানোন্মত্ত রমেশ নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। সে টেবিল-স্থিত একটী কাচের গোলাপদানি লইয়া মতিয়ার কপোলে সজোরে আঘাত করিল। "ওগো বাবা গো, মেরে ফেল্লেগো" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে চারিদিক কম্পিত করিয়া মতিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আশে-পাশে যাহারা ছিল, তাহারা সকলে ছুটিয়া আসিয়া পলায়মান রমেশকে ধরিয়া ফেলিল।

যথাসময়ে খুনী মোকদ্দমার আসামী হইয়া রমেশচন্দ্র প্রকাশ্য আদালতে বিচারপতির সম্মুখে নিজের সমস্ত অপরাধ অকপটে স্বীকার করিল। রমেশের তখন সত্যসত্যই অনুতাপ আসিয়াছিল।

রমেশ কাশীতে আছে রাজলক্ষ্মী তাহা জানিতেন। মায়ের প্রাণে কত আশার উদয় হয়। রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, কাশীতে থাকিলে হয়ত বাছার দেখা মিলিতে পারে। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়া রাজলক্ষ্মী একমাত্র বৃদ্ধা আত্মীয়ার সহিত কাশীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বিচারে রমেশের জেল হইল। নিজের অপরিণামদর্শিতা দোষে যে কুফল ফলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া রমেশ মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইল। সেই নির্জ্জন কারাগৃহে বসিয়া দিনরাত তাহার স্নেহময়ী মায়ের জন্য কাঁদিত—ভাবিত, যদি সে মায়ের কথা শুনিত, যদি মায়ের কথা পায়ে না ঠেলিত, যদি মায়ের কাতর মুখপানে চেয়ে এমন কাজ না করিত, তাহা হইলে তাহার মত সুখী কে! মা যে তাকে বড় ভালবাসিত। এমন দিন গিয়াছে যে, স্নেহময়ী মা পুত্রের দোষ ঢাকিবার জন্য নিজের স্কন্ধে তাহা হাসি-মুখে তুলিয়া লইয়াছেন।

একদিন রমেশ অধিক রাত্রে মত্তাবস্থায় বাটী আসায় তাহার পিতা একটী যষ্ঠি দ্বারা

তাহাকে আঘাত করিতে যান, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া নিজের স্নেহ আলিঙ্গনের মধ্যে পুত্রকে টানিয়া লইলেন, পিতার উদ্যত যষ্টি রমেশের মস্তকে না পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মস্তকে পতিত হইল, মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল কিন্তু স্নেহময়ীর তাহাতেও দৃকপাত নাই, তিনি যে বিপন্ন-সন্তানকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তিনি সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। রমেশের সেই সমস্ত অতীত স্নেহের কথা মনে পড়িল। মায়ের কাতর মুখখানি যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে বলিয়া বোধ হইল, অবসন্ন প্রাণে রমেশ যেন শুনিতে পাইল যে তাহার জননী তাহাকে সেইরূপ প্রাণের দুয়ার খুলিয়া বড় আগ্রহে ডাকিতেছেন—"আয় বাছা, আমার কাছে আয়। তোর সব জ্বালা জুড়াইবে।" রমেশ একবার মনে করিল যে আত্মহত্যা করে, কিন্তু মাকে না দেখিয়া তাহার মরিতেও সাধ হইল না।

ফাল্গুন মাস। শিবরাত্রি। কাশীধামে আজ মহাধূম। সমস্ত কাশীধাম পূর্ণ করিয়া কেবল "জয় বিশ্বনাথ জী কি জয়" শুনা যাইতেছে। পথ, ঘাট এত জনাকীর্ণ যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে অনেক কষ্টে যাইতে হয়।

রমেশের মাতা রাজলক্ষ্মী আজ অতি কষ্টে মণিকর্ণিকায় স্নান করিবার মানসে সেই জনতা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। কুপুত্র গর্ভে ধরিয়া তাঁহার মন এবং স্বাস্থ্য দুইই ভাঙিয়া গিয়াছিল।

মতিয়া মনে ভাবিয়াছিল—রমেশ পুনরায় আসিবে। কিন্তু যখন সে আর আসিবে না বুঝিতে পারিল, তখন সে মনে মনে বড় রাগিল। রমেশের মত খরচে-বাবু সে আজ অবধি দেখে নাই, রমেশকে হাতে আনিয়া সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। রমেশ জেল হইতে খালাস হইয়া পুনরায় আসিল না দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল—হয়ত আর কোনও স্থানে রমেশ আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহার শীকার এত সহজে হাত ছাড়া হইল ভাবিয়া সে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। মতিয়া বর্ত্তমানে রমেশ যে অন্য রমণীর চরণে নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে, সে কল্পনাও মতিয়ার প্রাণে সহ্য হইল না। এই বেশ্যার ভালবাসা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া রমেশ যখন সংবাদ পাইল যে তাহার জননী এই কাশীধামেই আছেন, তখন তাহার প্রাণ মাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমকলী যেমন রাত্রের শিশিরবিন্দু পাতে অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিতরণ করে, রমেশের মনের সৎপ্রবৃত্তিগুলিও সেইরূপ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে চিন্তামলিন শীর্ণ দেহখানি লইয়া অনুতপ্ত রমেশ মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল, মনে ভাবিল, এই কলুষিত পাপদেহ-মন লইয়া মায়ের চরণ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ অনুচিত, তাই শুভ পুণ্যদিনে কলুষ-নাশিনী ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া শুদ্ধচিত্তে মায়ের চরণ বন্দনা করিবে।

রমেশের বুকে ছুরী বসাইবার জন্য মতিয়া তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছিল। এ সুযোগ সে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সেও জনতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল রমেশ সবেমাত্র স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে, মুদিত-নেত্রে, যুক্তকরে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে। চকিতে সে নিজের বক্ষঃস্থলের মধ্য হইতে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। রাজলক্ষ্মী দেখিলেন, এক পিশাচী উদ্যত ছুরিকা হস্তে এক নিরীহ যুবকের প্রাণ সংহারে অগ্রসর, মায়ের স্নেহভরা প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, সন্তানের অভাব রাজলক্ষ্মী জানিতেন, তাই মায়ের ছেলে মায়ের বুক হইতে পিশাচীতে কাড়িয়া লয় দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সহানুভূতি এবং স্নেহে কাঁদিয়া উঠিল, সেই বিপন্ন যুবককে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মুহূর্ত্তে উভয়ের মধ্যে আসিয়া মা জগদ্ধাত্রীর মত দণ্ডায়মানা হইলেন। নিমিষে সেই উদ্যত ছুরিকা জননী রাজলক্ষ্মীর জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিল।

লোক জনের চীৎকার শব্দে রমেশের ধ্যান ভঙ্গ হইল, ফিরিয়া দেখিল যে তাহার বড় আদরের, বড় ভক্তির, বড় শান্তির আরাধ্যা জননী রক্তাক্ত কলেবরে প্রস্তরময় সোপানের উপর পড়িয়া আছেন, আর তাহার সেই বহুদিনের পরিচিতা পাপিষ্ঠা মতিয়া উন্মাদিনীর মত খল খল শব্দে হাস্য করিতেছে।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

অবসান।

উর্ম্মিলা। নিদারুণ নিদারুণ বাণী
গুণমণি কেন বল বার বার,
অন্ধকারে কেন ডুবাইছ আর ?
খুলে বল কোথা যাবে নাথ !
লক্ষ্মণ। আগে বল প্রিয়ে, হাসির অধরে
দিবে মোরে সে চির-বিদায়
সাধ্বী তুমি, বীরাঙ্গণা তুমি
জানি তুমি সত্যভঙ্গ না কর কখন।
উর্ম্মিলা। একি সত্য !
কিম্বা নাথ স্বপন কাহিনী,
বল শুনি কি বিপদ ঘটিবে আবার ?
লক্ষ্মণ। নহে স্বপ্ন, সত্য প্রিয়তমে,
জান নাকি দেব রঘুনাথ,
সত্যবাদী সন্ন্যাসীর পাশে,
ছিলেন নির্জ্জন গৃহে,
ছিল অঙ্গীকার যদি সে গৃহের দ্বার
ভ্রমেও লঙ্ঘয় কেহ
বর্জ্জিবেন শ্রীরাম তাহারে।
ভাগ্য-দোষে সে গৃহের দ্বারে
অভাগা প্রহরী ছিল,
সহসা দুর্ব্বাসা ঋষি করি আগমন
যাচিলেন রাজ-দরশন
বারিলে তাহারে, মহা ক্রোধভরে
অভিশাপ দিতে চাহে ঋষি
ব্রহ্মশাপ ভয়ে—প্রাণাধিকে !
পশিলাম গৃহ মাঝে আমি,
তাই রঘুমনি করেছেন বর্জ্জন আমারে,

চির নির্ব্বাসন, অসহ বেদন
এ জীবন রাখিব না আর
ঝাঁপ দিব সরযূর জলে।
দেখ দেখ মহা অন্ধকার,
ঘেরে পুনর্ব্বার
জীবন আকাশ মোর।
ঘোর হুহুঙ্কারে ডাকিছে শমন-দুত
তাই প্রিয়ে! করি অনুরোধ
হাসি মুখে দাঁড়াও সম্মুখে
শেষ বিদায়ের দিনে, শেষ দৃষ্টিপাতে
দেখে যাই হাসি-মুখ খানি।

উর্ম্মিলা। একি শুনি, একি শুনি হা জীবত-নাথ,
অভাগীর ভগ্ন হৃদে কেন বজ্রাঘাত।
(মূর্চ্ছা ও পতন)

লক্ষ্মণ। ভগবান মিনতি চরণে,
আর যেন নাহি হয় চেতনা সঞ্চার।
প্রিয়ে! প্রিয়ে! উর্ম্মিলে আমার
ঘুমাও জন্মের মত
সুখ-স্বপ্ন নেহার অনন্তকাল।
যাই চলে যাই
আর নাহি দেখিবারে চাই
অই ম্লান-মুখ, অই অশ্রুময় আঁখি
অই ম্লান স্ফুরিত অধর
ধীরে ধীরে নিগড় জড়ায় পায়।
(উর্ম্মিলার নিকট উপবেশন করিয়া)
প্রিয়ে! প্রিয়ে! জীবিত-ঈশ্বরী,
পার যদি জাগ একবার,
এই শেষ দেখা দেখিবে অভাগা,
আর ত হবে না দেখা,
আর ত হৃদয় ব্যথা পাব না জুড়াতে,
প্রিয়তমে! উন্মিলি নয়ন,
চাহ অভাগার পানে,
যে দৃষ্টিতে মরণো সুখের হয়,
সে দৃষ্টিতে চাহ একবার,
তবে মোর মরণে কিসের ভয়,
কিন্তু কে ও ভীষণ মুরতি,
ভীম হাস্য হাসে উপহাসে
দাঁড়ায়ে বিমান পথে
মৃত্যুতে কাতর দেখে মোরে,
বিদ্রুপ করিছে যেন;
না না হেথা দাঁড়াব না আর?
প্রিয়তমা ঘুমাক আমার,
জাগে যদি, সত্য রক্ষা নারিব করিতে,
তবে প্রিয়ে জনমের মত
চলিলাম, ফিরিব না আর।
নয়নের ধার চির পুরস্কার,
প্রেমের তা ভেব মনে মনে,
স্মরিয়া এ অভাগারে কাঁদিয়া উঠিলে প্রাণ;
বেঁধ প্রাণ ধৈর্য্যের বন্ধনে.
মিলন এ দেহের ত নয়,
এ যে দুটি আত্মার মিলন
পুনঃ সেই খানে, সেই শান্তি নিকেতনে
দুই জনে মিলিব আবার।
দুঃখহারা তারা শুভঙ্করী,
দাবদগ্ধা কুরঙ্গীরে আজ,
চলিলাম রাখি মাগো পদমূলে তোর।
জানি তুমি জগত জননী,
দেখ যেন কাঁদে না তনয়া তব,
কানন বল্লরী—
অযতনে শুখায় না যেন। (প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। (চেতন পাইয়া) কৈ আমার প্রাণনাথ, কৈ আমার ভিখরিণীর ধন কৈ? নাথ যে আমার বনবাসে গিয়েছেন, বীরবর লঙ্কার রাক্ষস বধ করেছেন। ও কি স্থর্পনখা তুই ওখানে কেন? ঐ দেখ সমুদ্রের কত বড ঢেউ, তুই ওখানে ডুবে মর, আমার ধন আমি বুকে করে রাখি। ছি ছি এ কি করলে নাথ, দাসী বলে চরণে ঠেল্‌লে কেন? তুমি ঐ সমুদ্রের ধারে দাঁড়াও, আমি ঐ শীতল জলে ডুবে মরি। ওমা পাগল হলাম নাকি? আমি যে বিধবা—আমার স্বামী মরেছে, আমি পথের ভিখারিণী হয়েছি—আমার হাতে এ নোঙ্গা কেন? কপালে সিন্দুর কেন? আয় আয় রাক্ষসী আয় মুছে দে।

শ্রুত। ওকি দিদি! তুমি অমন হয়েছ কেন? আমার বড় ভয় হচ্ছে।

উর্ম্মিলা। তুই শূর্পনখা, তোর আবার ভয়, আমার প্রাণেশ্বরের কোমল বক্ষে তুই শক্তিশেল মেরেছিস, নাথ আমার চৌদ্দ বৎসর উপবাস করে আছেন, আমি আজ কত আহ্লাদ করে খাওয়াতে গেলাম, তুই কি না বিষ ঢেলে দিলি। হা, হা, হা, (হাস্য) দুরহ দুরহ পালিয়ে যা পালিয়ে যা—ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে বধ ক'র না। আমার নাথ ঘুমিয়ে আছেন তোমরা কেউ গোল কর না, নাথের আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

শ্রুত। দিদি! তোমার পায়ে পড়ি অমন হয়ো না—কেন সাধ ক'রে অমঙ্গল ঘটাবে?

উর্ম্মিলা। সত্যিই তো আজ চৌদ্দবৎসরের পরে ঘুরে এল, আজ কোথায় হাসব—তা না হয়ে কাঁদলাম। মন্দ ভাগিনী আমি চক্ষের জল ফেল্লাম। তা বলে পোড়ার মুখি তুই কেন গাল দিবি! ঐ দেখ ফুলের মালা, ঐ দেখ বরণ ডালা, তারপর মায়ের কোলে আমার প্রাণনাথ, আর ছুঁতে নারবি, যাই আজ সকাল করে সরযুতে নেয়ে আসি। আজ কি আমার ব'সে থাকবার সময় আছে?

শ্রুত। হায়, হায়, একবারে জ্ঞানহারা, বিধিরে! তোর মনে কি এই ছিল?

উর্ম্মিলা। এস নাথ, এ দুঃখের দিনে আমায় বঞ্চণা ক'র না। আমি আপনার দুঃখে কান্দি, তুমি কেন কাঁদ প্রাণাধিক! আমাকে সাপে খেয়েছে—আমার বুকে ছুরি মেরেছে—আমার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে,আমার সঙ্গে লোকের এত বাদ কেন? আজ গয়না প'রে চাঁদের আলোয় স্নান করে, আহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছি, আমাকে বল্লে কি না বিধবা হও, আমি জলে ডুবে মরব, তোমরা আমাকে আট্‌কাবে কেন? যেখানে আমার প্রাণেশ্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে, আমি সেইখানে রাণীর বিছানা পেড়ে শোবো, আর সেই গানটী—যেটী প্রাণনাথ রাত দিন গাইতেন, সেই গানটী গাইতে গাইতে তাঁর কোলে ঘুমিয়ে পড়বো। আর ত ঘুম ভাঙ্গবে না।

শ্রুত। সর্ব্বনাশ! এ যে বিষম বিপদ দেখছি, দিদি বুঝি আর বাঁচবে না—এখান হতে নিয়ে যাই বা কেমন ক'রে।

উর্ম্মিলা। আজ আর আমি কোথাও যাব না। আজ আমি শ্বশুর বাড়ী যাবু, আমাকে আলতা পরিয়ে দে, ঐ দেখ স্বর্গ হ'তে রথ

নাম্‌ছে ; হৃদয়েশ্বর আমার লঙ্কার যুদ্ধ জয় করে-ছেন, তাই আজ যত দেবতারা আসছেন—ওমা ওরা সব আবার কে ? আমি রাজরাণী, আমি এত লোকের ভিতর কেন ? ছি ছি লোকে কি বল্‌বে ? তবে কত দূরে ; ঐ যে আকাশের আলো—ঐ যে তারার মালা ফুটে রয়েছে—ঐ যে মেঘের গায়ে গায়ে শত শত চাঁদ উঠেছে, ও দেশ কতদূরে আছে। নাথ, তুমি ঐ খান হ'তে হাত বাড়িয়ে দাও, আমি ঐ সোনার বরণ মেঘের উপর চড়ে,তোমার কাছে যাই। ওকি ! আবার যে বিমুখ হ'লে— দাসী কি দোষ করেছে নাথ ! আমার যে আর কেউ নাই—দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

(প্রস্থান ও শ্রুতিকীর্ত্তির পশ্চাৎ গমন।)

(পটক্ষেপন)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

পাগল আমার।

(গীতিকা)

পাগল আমার, প্রেমের পাগল,
সামান্য মানুষ নয়।
পাগল আমার পবিত্র হৃদয়,
ত্যাগের আদর্শ হয় ॥
পাগল আমার, বাহির জগতে
নাহি করে বিচরণ।
অন্তর্মুখ হ'য়ে, অন্তর জগতে
করে রস আস্বাদন ॥
পাগল আমার, সুবুদ্ধি, সুধীর,
বিচারেতে সুনিপুণ।
পাগল আমার উচ্চ অধিকারী,
বিষয় বুদ্ধিতে হীন ॥
আদর্শ গৃহিণী তনয়ে শোভিত
মুক্ত আত্ম নামে দেহি।
পাগল আমার নহে ত সন্ন্যাসী,
আসক্তি বিহীন গেহী ॥
পাগল আমার কি যেন নেশায়,
তনময় অনুক্ষণ।
বিজন কুটীরে, গম্ভীরা মাঝারে,
বিরহ ব্যাকুল মন ॥
পাগল আমার, ঐহিকের সুখ,
নহে ত সন্ধানকারী।
অতিন্দ্রিয় সুখ, বুঝেছে পাগল,
তাই, তার আজ্ঞাকারী ॥
পাগল আমার গৌরাঙ্গ নাগরী,
রাধা ভাবে লুব্ধ চিত্ত।
পাগল আমার, গৌরাঙ্গ লাগিয়া,
ছেড়েছে সকল বিত্ত ॥

---

* এই পাগল শ্রীল রাধামাধব, সম্প্রতি নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি, একজন অদ্বিতীয় গৌরভক্ত ছিলেন। প্রকৃত মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে। ইহার পবিত্র কলেবর, "সোনামুখী আনন্দাশ্রম" হইতে কিছু দূরে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। পাগল রাধামাধবের উপদেশ, "ভক্তি" 'আর্য্য-দর্পণ', বৈষ্ণব-সঙ্গিনী প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। পাগলের মৃত্যুকালে, জপ-নিরত করধর, বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ ছিল,—শিবচক্ষু দুটীর দীপ্তি, মৃত্যুর পরেও, বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল ছিল। ভবিষ্যতে পাগলের "কথামৃত", "আলোচনায়" আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

পাগল আমার, কাঙ্গালের বেশে ;
এ কাঙ্গালে চিনিবে কে ?
অনুরাগ যার আছে হৃদয়েতে,
জানিবে, বুঝিবে সে ॥
পাগল আমার, ঐশ্বর্য্য রাশিরে,
করে তৃণবৎ জ্ঞান।
"সেরেক তণ্ডুলে সন্তোষ তাহার,"
এ শুধু মাধুর্য্য ভাণ ॥

শ্রীরসিকলাল দে।

ছিন্ন মুকুল।

শান্ত গগণ কান্ত বিমল
চন্দ্র-কিরণ ধারে
বিশ্বের শোভা ফুটিয়ে রাখে
কুঞ্জকুসুম হারে।
ওই যে কুঞ্জ মধু-সখা বাস
আধফোটা কটা কলি
নাচে আনন্দে সুখ-হিল্লোলে
সকাল-সন্ধ্যা বেলি,
তপন যখন তপ্ত পরাণে
ছড়ায় কিরণ ধার
শুষ্ক মুখে চঞ্চল কলি, যায়
অঞ্চল আড়ে মার,
মাতা তখন স্মিতমুখে নিয়ে
হৃদয়ের মাঝে সুখে
বলে "বাছা তোরা ফুটেছিস ক'টা
থাক্‌লো আমার বুকে।
হাঁসিবি খেলিবি ছড়াবি বাস
সুখী হবো আমি মনে
বিভোর ঘুমনে কাটা'ব নিশি
নেরালা এ ঘোর বনে।"
একদিন শেষ নিশীথ ঘোরে
চঞ্চলা বালিকা একা
কুঞ্জদ্বারে মূরতি কঠোর
দিল রে আপনি দেখা
বলে "ওহে আজি শূন্য ডালি
করেতে দেখ মোর
(তাই) মাগিতে এসেছি কলিটী তব
তুষিতে দেবতা মোর।"
দুষ্ট বালা হৃষ্ট-চিতে তুল্‌তে
কলিটী আপন বলে ;
নীরবে কলিটী পড়িল খসি
দেব-চরণ-তলে।
বিশুষ্ক ধরার নিরস বুকে
শান্তি-সুখ-বিহনে।
ত্রিদিব কুসুম ফুটিতে গেল
নন্দন চারু নন্দনে।

শ্রীসুধারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নিভৃত কামনা।

আমি,
নিভৃতে নীরবে, করিব গো পূজা,
বাসিব তোমারে ভাল।
সাধনা সলিলে, মাথায় পীরিতি
ঢেলে দিব অবিরল ॥

দূরে থাক কিবা, নিকটে আমার,
অনাদর অযতনে।
চাও বা না চাও, ফিরিয়া বারেক,
সকরুণ আবাহনে॥
চিরদিন তবু তুমি গো আমার,
তোমার প্রতিমা খানি।
সাজায়ে প্রণয় কুসুমের হারে,
রাখিব হৃদয়ে আনি॥
ধরম, করম, ইহ-পরকাল,
জীবনের সুখ আশা,—
সাধ, আকিঞ্চন, প্রেম, আরাধন,
প্রাণভরা ভালবাসা;—
তোমার(ই) উদ্দেশে, দিব গো অঞ্জলী,
তোমার(ই) ও রাঙা পায়।
লহ তুলে কিবা, ফেলে দাও দূরে,
না চাহি বুঝিতে তা'য়॥
তোমাতে মিশায়ে, তোমার হইয়া,
জুড়াব আকুল প্রাণ।
নাই বা মিলিল, করুণা তোমার,
আদরের প্রতিদান॥
কল্পনা-নয়নে, বিভোর হইয়া,
হেরিব স্বরগ শোভা।
তোমার(ই) ধেয়ানে, ঘুচিবে তিমির,
উজলি উঠিবে আভা॥
না চাহি জানাতে, এ জ্বালা আমার,
কিছু না বলিতে চাই।
এ ক্ষুদ্র হৃদয়, নিরাশ অনলে,
পুড়ে হয়ে যা'ক ছাই॥
নীরবে গো শুধু, সহিব যাতনা,
নীরবে আঁখির ধার—
উন্মাদ অধীর, পড়ে যদি ঝ'রে,
না মানিয়ে বাধা কার;
নিরজনে বসি', ফেলিব মুছিয়ে,
জানিতে দিব না কারে।
কি অভাবে প্রাণে, দারুণ যাতনা,
কি মোর করম ফেরে॥
তোমারই সাধনে, ভুলিব সকলি,
তোমাময় হবে প্রাণ।
ও মোহন রূপে, হৃদয় ভরিবে,
হবে জ্বালা অবসান॥
দূরে থেকে যদি, থাক সুখে তুমি,
থেক দূরে দূরে মোর।
বারেক দরশ, যাচিব না কভু,
আমার সকল চোর॥

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

একটী তারা।

জলবর্ত্ম নিলাম্বর
অস্তগত সুধাকর।
নিশি ভোরে একটী তারা রয়েছে জাগিয়া।
স্বভাব নিরব স্তব্ধ
নাহি সাড়া নাহি শব্দ।
ক্ষেত্রতটে দৃষ্টিবদ্ধ বালাদীর্ণ হিয়া।
বদন খানি ঢল ঢল,
চক্ষু দুটী ছল ছল,
মলিন তাঁর সিতাঞ্চল আঁধারে লুটিয়া।
বদনে কালিমা রেখা,
পায় নাহি কারো দেখা,
সঙ্গি যারা ফেলে একা গিয়াছে চলিয়া।
অন্ধকার চারি পাশে,
ক্ষুদ্র বুক কাঁপে ত্রাসে!
জীবন প্রদীপ শ্বাসে যায় বা নিভিয়া।
বিশাল আকাশ শুধু
মরু মত করে ধু, ধু,
পরিত্যক্ত তাঁরা-বন্ধু কাঁদে গুমরিয়া।
কি কাতর করুণ স্বর—
নরশ্রুতি অগোচর—
চক্ষুজলে ধরাতল গিয়াছে ভিজিয়া।
নিশি প্রায় ভোর ভোর,
কেটে গেছে ঘন ঘোর,
বিহগ কণ্ঠে উঠে "শোর" থাকিয়া থাকিয়া।
কুন্দ নিভ ওষ্ঠ পুটে;
মলিন হাসি নাহি লুটে;
কেহ নাই, একা ছুটে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
বিপদাপদ শত শত,
সহে প্রভো আর কত;
পাথরে গঠিত নহে এ কোমল হিয়া।
কেহ নাহি, গেছে সবে,
একা পড়ে আছি ভবে,
বুকে ধোরে স্মৃতি কত শোক অশ্রু নিয়া।
শূন্য দৃষ্টি শূন্য স্পর্শ,
শূন্য প্রাণ শূন্য হর্ষ।
পথহারা তারা মত চলেছে ছুটিয়া।
সাথিগণ গেছে চলে;
ভাসি সদা অশ্রুজলে;
বল প্রভু গেছে "তারা" কোন্‌পথ দিয়া।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম।

ধরকার।

হিন্দী ধর অর্থে রজ্জু, ধরকার রজ্জুনির্ম্মাণকারী। ধরকারগণ ডোম জাতির শাখা বলিয়া উক্ত হয়। ইহারা বেঁত-বংশীয় (বেত) বলিয়া কোন কোন স্থলে পরিচিত; কারণ, ইহারা বেত্রদ্বারা নানাবিধ গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদিগের মির্জ্জাপুরের বিভাগ, রিস্‌লী সাহেব লিখিত বিহারের বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শোণের দক্ষিণে আরিল, নেওরিয়া, দোরিহা ও নগরহা এই চারি বিভাগ বা কুড়ি। এই চারি শাখার মধ্যে আরিল শাখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অপর তিন শাখার মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান হইয়া থাকে। আরিল এক শ্রেণীর বংশের নাম। এই জাতীয় বংশে কুলা, চালুনী ইত্যাদি নির্ম্মিত হয়। নেওরিয়া এক জাতীয় নরম ও ছোট বাঁশ। দোরিহাগণ দোরি নামক এক প্রকার শক্ত ও মজবুত বাঁশ (এই বাঁশে ঘুণ ধরে না) দিয়া ঝুড়ি ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে বলিয়া দোরিহা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নগরিহা নাম নগর হইতে, নগর বাঁশ মোটা ও খুব বড বড হয়।

মামু ও ফুফার বংশের অন্ততঃ তিন পুরুষ গত না হইলে বিবাহের আদান প্রদান করে না। অযোধ্যা প্রদেশে কেহ ভগ্নীর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না এবং যে পরিবারে কন্যার বিবাহ দিয়াছে সেই পরিবারে অন্ততঃ তিন পুরুষ অতীত না হইলে পুত্রের বিবাহ দিতে পারে না। এক সঙ্গে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই; কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর কাল হইলে, তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। পরিবর্ত্ত বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। শোণের উত্তরে বেণবংশ, বরুয়া ও ডোম এই তিন শাখা। বেণবংশীয়েরা এইরূপ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, হিন্দুর ন্যায় আজিকালি আপনাদিগের গোত্রের নাম লইতে শিখিয়াছে। তবে বিলথারিয়া ও মতার এই দুই গোত্রের অধিক গোত্র অবগত নহে। শোণের দক্ষিণস্থ ধরকারগণ বাঁশকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে।

মির্জ্জাপুরের ধরকারগণ কহে যে, পরমেশ্বর তাহাদিগের আদি-পুরুষকে সৃষ্টি করিলে সে বাঁশের নীচে বসিয়া থাকে। পরমেশ্বর তাঁহাকে একখানি বাঁকা ছুরী দিয়া কহেন যে, সে ছুরী দিয়া বাঁশ কাটিয়া ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করিবে এবং তাহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইবে।

পঞ্চায়ৎ—

পঞ্চায়তের কর্ত্তার নাম 'মহতো'; মহতোর একজন সহকারী আছে, তাহার নাম দেওয়ান। দেওয়ান বেশ ক্ষমতাশালী লোক। পঞ্চায়ৎ অভিযোগ শুনে এবং আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করে। মহতো অবশেষে শেষ নিষ্পত্তি করে। সাধারণ শাস্তি—ভাত ও শূকরের মাংস দিয়া স্বজাতীগণকে দুই দিন খাওয়াইতে হয়। দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে দ্বাদশ বর্ষের জন্য জাতিচ্যুত হয়। এই বার বৎসরের মধ্যে যদি পঞ্চায়ৎ ক্ষমা না করে কিম্বা সে পঞ্চায়তের বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহার পরিবার মধ্যে যাবতীয় বিবাহ বন্ধ থাকে, সে স্বজাতীয়গণের সহিত পান ও ভোজন করিতে

পায় না, এক হুঁকায় তামাক খাইতে পায় না, কিম্বা পঞ্চায়তে স্বজাতীয়গণের সহিত এক বিছানায় বসিতে পায় না। অযোধ্যাপ্রদেশে রীতিমত পঞ্চায়ৎ নাই ; তবে প্রয়োজন হইলে সকল পরিবার হইতে এক এক জন প্রাচীন লোক একস্থানে একত্রিত হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে দলপতি মনোনীত করে ; দলপতি বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকে। এক এক মণ্ডলীর মধ্যে সেই সেই মণ্ডলীর লোকদিগের বিবাহকার্য্য হইয়া থাকে, নতুবা ইহারা পাত্র ও পাত্রীর জন্য দেশান্তরে গমন করে না।

বিবাহের নিয়ম—

একজন যত পত্নীর ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম,তত পত্নী রাখিতে পারে। অযোধ্যাবাসিগণ কাহার সপ্তাধিক স্ত্রী রাখিবার নিয়ম নাই। কিন্তু ধরকারগণের অবস্থা বিবেচনা করিলে এককালে একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কাহারও কাহারও একাধিক পত্নী থাকে, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা (জেঠী মেহেরারু) গৃহকর্ত্রী হয়। উপপত্নী রাখিবার নিয়ম নাই। রমণীগণ অযথা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। অনূঢ়া কন্যার ব্যভিচার প্রকাশিত হইলে, দণ্ডস্বরূপ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে দুই দিবস ভোজন করাইতে হয়। এইরূপ ঘটনায় প্রণয়ী, প্রণয়িনীর পিতাকে ৮৲ টাকা নগদ ও প্রণয়িনীর মাতাকে বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। এই বস্ত্র প্রদানের নাম 'মাই কাপড়া' (মাতার কাপড়)। ইহাতে বোধ হয় যে, এইরূপ ঘটনা ইহাদিগের মধ্যে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। পিতা, তৎপরে পঞ্চায়তকে পাঁটার মাংস ও ভাত খাওয়ায় এবং প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, স্বামী ও স্ত্রী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। বিবাহের বয়স ১৭ কিম্বা ১৮ বৎসর। পাত্রের ফুফা (পিতৃস্বসৃপতি) বিবাহের ঘটক। পাত্রের পিতা কন্যাপণ প্রদান করে। কন্যাপণ নির্দ্দিষ্ট। কন্যাপণ নগদ ৮৲ টাকা, একখানি কাপড ও একশতখানি পুরী। বিবাহের সময় এই পুরী (আটার লুচী) সকলকে খাইতে দেয় এবং বস্ত্রখানি পাত্রী প্রাপ্ত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রী পক্ষীয় আত্মীয়গণ পাত্র ও পাত্রীর অঙ্গ বৈকল্যাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকে। পরে কোনরূপ অঙ্গহীনতা প্রকাশ পাইলে বিবাহ বন্ধ হয় না। যদি বধূ পঞ্চায়তকে বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিয়া স্বামীর ঘর করিতে অসম্মতা হয়, তাহা হইলে বধূর পিতা বিবাহে প্রদত্ত কন্যাপণ প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য হয়। যদি স্বামী পত্নীকে রাখিতে অসম্মত হয়,তাহা হইলে পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ও স্ত্রীকে আপন গৃহে রাখিতে বাধ্য হয়। যদি স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে একে অপরকে পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পঞ্চায়তের বিচারাধীন অবশ্যই হইতে হইবে এবং কেবল মুখের কথায় কোনপক্ষ দোষী প্রমাণিত হইবে না, চাক্ষুস প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা রমণী পুনরায় জাতি মধ্যে বিবাহ করিতে পারে। এই বিবাহপ্রথার নাম 'সগাই' বা 'ধরৌনা'। রীতিমত বিবাহোৎপন্ন ও সগাই প্রথায় বিবাহিতা বিধবার গর্ভজ

সন্তানগণ পৈত্রিক বিষয়ের তুল্যাধিকারী। যদি কোন ব্যক্তি উপপত্নী রক্ষা করে এবং তৎ-কর্ত্তৃক পক্ক অন্নাদি ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জাতিচ্যুত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি জাতীয় ভোজ প্রদান করিতে অক্ষম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত জাতীয় ভ্রাতৃগণ তাহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জারজ সন্তান পিতার জাতিপ্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত ভোজন বা জাতিমধ্যে বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না। বিপত্নীক 'সগাই' প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। বিধবা বিবাহার্থী বিধবার গৃহে গমন করিয়া প্রস্তাব করে "হামার ঘর বসাদে" (আমাকে সংসারী কর।) বিধবার পিতা কুমারী বিবাহের ন্যায় বিধবা কন্যার বিবাহেও পণ গ্রহণ করিয়া থাকে, একটী ভোজ দেয় এবং পঞ্চায়ৎ আহ্বান করে। যদি এই সময় কোন ব্যক্তি বিধবার দাবী করিয়া অগ্রসর হয় এবং কহে যে, কেন তাহার রমণীকে অপর ব্যক্তিকে দান করা হইতেছে? তাহা হইলে পঞ্চায়ৎ, ভাবী জামাতা হইতে প্রাপ্ত কন্যাপণ, বিধবার দাবী-কারককে প্রদান করিবার জন্য বিধবার পিতাকে অনুজ্ঞা করে। অবশ্যই একমাত্র দাবীকারক বিধবার দেবর। তৎপরে বিধবা বিবাহকারী বিধবাকে গৃহে লইয়া আসিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দুর ও কর্ণে 'তারকী' (তাল-পত্র নির্ম্মিত কর্ণাভরণ) পরাইয়া দেয় এবং জাতীয় ভোজ প্রদান করিলেই বিধবা সর্ব্ববাদী সম্মত তাহার পত্নী হইল। অপুত্রক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে। পুত্রগণ পিতৃ-ধনের অধিকারী বটে কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র অপর পুত্রগণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অংশ পাইয়া থাকে। কত অধিক পাইবে সে মীমাংসার ভার পঞ্চায়তের উপর। কন্যার পিতৃধনে কোন দাবী নাই; এমন কি বিবাহের পর গ্রাসা-চ্ছনের পর্য্যন্ত অধিকারিণী হয় না। যদি মৃতের ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে বিধবা যাবজ্জীবন অন্ন-বস্ত্র পাইতে পারে। বলা বাহুল্য, বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে স্বামী-ধনে বঞ্চিতা হয়। তবে বৃদ্ধা হইলে দেবরগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হইয়া থাকে।

সম্পর্ক।

পিতা	...	দৌয়া;
পিতামহ	...	বাবা;
মাতা	...	দাই;
মাতামহী	...	বড় কি দাই;
জ্যেষ্ঠতাত	...	বড় বা বড়কা
স্ত্রী	...	অমুখের মাতারী;
কন্যা	...	বহিন্;
শ্বশুর	...	মহতো;
বন্ধু	...	মিত, ইয়ার;

এক নামের দুইজন পরস্পর পরস্পরের মিত (মিত্র);

স্বগ্রামবাসী ... গাঁওয়া পরিবার।

জন্ম-সংস্কার—

গর্ভিনীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার হস্তপদাদি ধুইয়া দেয় এবং ছাগ ও কুক্কুট বলি দিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের উপাসনা করিয়া থাকে। গর্ভিনীর অবস্থা বিপজ্জনক বিবেচনা করিলে অশ্বত্থের বল্কল সিদ্ধ করিয়া তাহার

সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলে। ভূমির উপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; চামারিন্ ধাত্রী নাড়ী কর্ত্তন করিয়া জন্মস্থানেই প্রোথিত করে এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত অগ্নিপাত্রে একখণ্ড তাম্র ও একখণ্ড লৌহ রাখিয়া দেয়। ষষ্ঠ দিবসে (ছঠী) চামারিন্ বিদায় হয় এবং ননদ প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়। সূতিকাগার পরিষ্কার করা ননদের কার্য্য। মৃত্তিকার পাত্র সকল পরিত্যাগ করে এবং নূতন পাত্র আনয়ন করে। এই দিবস ২।১ জন স্বজাতিকে ভোজন করাইয়া থাকে। দ্বাদশ দিবসে প্রসূতি (বারহী) পুনরায় স্নান করে এবং গৃহাদি পরিষ্কৃত হয়। এই দিবস প্রসূতি পরিবারবর্গের আহারীয় দ্রব্যাদি রন্ধন করে এবং শুচী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সময় হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রী-সহবাস করে না। অষ্টম ও নবম বর্ষে শিশুর কর্ণবেধ (কান ছেদন) ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কর্ণবেধের দিবস হইতে বালকবালিকাগণ পান-ভোজন বিষয়ে জাতীয় নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করে। বিহার অঞ্চলে কর্ণবেধের সময় গুড় খাইতে দেয়। তথায় কহে,—"এ গুড় খায়েন, কান ছেদায়েন্।"

বিবাহ—

বর ও কন্যাকর্ত্তার মধ্যে সুরাপাত্র বিনিময় করিয়া পান করিলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল বুঝিতে হইবে। বরকর্ত্তা এক পাত্র মধ্যে দুইটী টাকা রাখিয়া দেয় এবং কন্যাকর্ত্তা গ্রহণ করে। প্রথমে মাটি মঙ্গর, তৎপরে গাত্রহরিদ্রা। পাত্র বা পাত্রী গাত্রে হরিদ্রা প্রদান করিবার পূর্ব্বে বরের পিতা বরের এবং কন্যার পিতা কন্যার গাত্রে, দূর্ব্বা গুচ্ছায় কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া, সিঞ্চন করে এবং কহে, "এই বিবাহে আমার পুত্র বা কন্যা সুখী হয়, তাহা হইলে ছাগ বা কুক্কুট বলি দিয়া ও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া পিতৃ-পুরুষের পূজা দিব।" বরের মাতা বরকে ক্রোড়ে লইয়া বিবাহ-মণ্ডপের মধ্যস্থ উদুখলের (ধান্যাদি কণ্ডনার্থ পাত্র বিশেষঃ) উপর উপবেশন করিলে বর, বরের মাতা ও বিবাহ কলস সূত্র দ্বারা বেষ্টন করে এবং ঘৃত গুড় আহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমকার্য্য সম্পন্ন করে। বরের ভগ্নী হোমাগ্নির ধূম হইতে আপন অঙ্গুলিতে কজ্জল সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার চক্ষে প্রদান করে। তৎপরে মাতার উপর 'আমিনা' ভবানীর আবির্ভাব হয়। মাতা কম্পিতা হইতে থাকে; আত্মীয়গণ তাহার উপর চাউল নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায়। অনতিবিলম্বে মাতা প্রকৃতিস্থা হইয়া বরকে বরণ (পরছন) করে। জলপূর্ণ জলপাত্র (লোটা), মুশল, প্রজ্বলিত দীপ-সমন্বিত থাল (থালি) লইয়া বরণ করে। প্রথমে এক ঢেলা আটা তৎপরে লোটা ও তৎপরে মুশল দ্বারা পাঁচ পাঁচ বার বরণ করে। লোটার দ্বারা বরণ করিবার সময় প্রত্যেক বার লোটা হইতে কিঞ্চিৎ জল ভূমির উপর নিক্ষেপ করে এবং মুশল দ্বারা বরণ করিবার সময় প্রত্যেক বার যে স্থানে লোটার জল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানের ভূমি মুশল দ্বারা স্পর্শ করে। বর মাতাকে প্রণাম করে; মাতা "যাও পুত্র, যাও পুত্র" বলে। বর কন্যার দ্বারে উপস্থিত হইলে

* Chrsitian, Behar Proverbs, 68.

কন্যার পিতা একটী ঝুড়ি লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করে, এই ঝুড়ির মধ্যে হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র থাকে; বস্ত্র বর পরিধান করে এবং ঝুড়ি আপনার কোন আত্মীয়কে প্রদান করে। বর ও কন্যাপক্ষীয়গণ দ্বারদেশে মাদল বাজাইয়া নৃত্য করে। নৃত্যের সময় পুরুষেরা পায়ে ঘুঁগুর বাঁধে এবং তবলা বাঁশী (বাঁশুলী) ও মাদল (মান্দল) বাজায়। কখন কখন অত্যাধিক আনন্দে উল্লম্ফন ও চীৎকার করে। তৎপরে তাহারা বিশ্রামার্থ গ্রামের বহির্দ্দেশে কোন বৃক্ষমূলে আশ্রয় লয়। তথায় কন্যাপক্ষের এক ব্যক্তি তাহাদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া দেয়। রাত্রিতে বরকন্যা, কন্যাগৃহের অঙ্গনে উপবিষ্ট হইলে ফুফা উভয়ের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক বরের হস্তে কন্যার হস্ত স্থাপন করে। কন্যার অঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরী পরাইয়া উভয়ের হস্তে জল ঢালিয়া দেয় এবং অতি উচ্চৈস্বরে কহে, "বর-কন্যা চিরঞ্জী রহে।" বরকন্যা চিরজীবী হউক। এই বাক্য পাঁচ বার উচ্চারণ করে এবং পাঁচ বারই জল হস্তের উপর ঢালিয়া দেয়। বিবাহ-মণ্ডপ-মধ্যস্থ শিমূল (শিমল) বৃক্ষের শাখাকে বর ও কন্যা পাঁচ বার প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে উভয়ের সম্মুখে একখানি শীল রাখিয়া তাহার উপর এক টুকরা সুপারী রাখিয়া দেয়; বর কন্যার পদ ধারণ করিয়া কন্যার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সুপারী-খণ্ড শীল হইতে ফেলিয়া দেয়। ইহার নাম 'কুড়ি মিট্না'। ইহার অর্থ এই যে, নিষিদ্ধ কুড়িতে বিবাহ না হওয়ার প্রথা অক্ষুণ্ণ (বজায়) রহিল। তৎপরে বর সিন্দুর লইয়া বধূর নাসিকাগ্র হইতে সীমন্তের শেষসীমা পর্য্যন্ত লেপিয়া দেয়, এই সময়ে বধূর ভগ্নী আসিয়া অঞ্চল প্রান্ত দিয়া ভূমিতলে পতিত প্রত্যেক সিন্দুরকণা যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া লয়। ইহার নাম 'সেন্দুর বহোরনা।' এই কার্য্যের জন্য বধূর সহোদরা দুই আনা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে বর ও বধূ বাসর ঘরে গমন করে। তথায় রমণীগণ বরের সহিত গ্রাম্য কৌতুক করিতে ব্যাপৃতা হয়। পরে ভোজনের ব্যাপার ও বধূর শ্বশুরালয়ে গমন।

বিবাহের এক বা দুই দিবস পরে বর-বধূ বিবাহ কলস লইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গমন করে। প্রথমে বধূ বরকে পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং তাহার কলস জলে নিমগ্ন করিয়া রাখে; বরও বধূকে পশ্চাতে রাখিয়া আপন কলস মগ্ন করে। পরে উভয়েই কলসের অন্বেষণ করিতে থাকে। প্রাপ্ত হইলে জলপূর্ণ করিয়া গৃহে আগমন করে। ইহার নাম 'কলসা ডুলানা।' গৃহে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে জল ঢালিয়া কিঞ্চিৎ বুঁদিয়া (ছোলার বেশম ঘৃত পক্ক) রাখিয়া দেয়। তৎপরে তাহারা দেওনাথের স্থানে আসিয়া ঘৃত ও শর্করা আহুতি দিয়া হোম করে। এইবারে বিবাহোৎসব সমাধা হইল। বিবাহে বর কর্ত্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুর দান অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

শব সংকার প্রথা।

স্থান বিশেষে শবদাহ ও শব সমাহিত করে। মির্জাপুরের ধরকারগণ শবদাহ করিয়া থাকে। সচরাচর নদী তীরেই সৎকার কার্য্য সম্পন্ন করে। সৎকার করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল স্ব স্ব পদাঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুরীয়োপরি ঢালিয়া দেয়, পুরে

অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া অগ্নির উপর ধারণ করে। অবশেষে মৃতের গৃহে আসিয়া উপনীত হয়। তথায় নিস্তব্ধভাবে ক্ষণিকক্ষণ উপবেশন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। তৃতীয় দিবসে মুখাগ্নি প্রদানকারী চিতা-ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে এবং জুরাই ঘাসের শীষ নদীতীরে প্রোথিত করিয়া প্রেতের আশ্রয় স্থান করিয়া দেয়। দশ দিবস পর্য্যন্ত উহার উপর জল সেচন করিয়া থাকে। দশম দিবসে ঘাট। জ্ঞাতিগণ পরস্পর পরস্পরের ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তজ্জন্য নরসুন্দরের অপেক্ষা রাখে না। চিতাগ্নি প্রদান কর্ত্তা আটার পিণ্ড দান করে এবং প্রেতের নামে তিন অঞ্জলী জল ভূমির উপর নিক্ষেপ করে। জলাঞ্জলী প্রদানের সময় হস্তদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে রক্ষা করে। কোন ব্রাহ্মণ আহুত হন না। পুরহিতের কার্য্য মৃতের ভাগিনেয় দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং ভাগিনেয় দক্ষিণাস্বরূপ এক খানি কুঠার ও একখানি ছুরি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মুখাগ্নি প্রদান করিয়াছে তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার আত্মীয় ও পঞ্চায়তের সদস্যাগণ উপবেশন করে এবং তাহার ভগ্নীপতি তাহার মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দেয়। আজি ইহাও মৃতের সন্তান পিতৃপদ প্রাপ্ত হইল।

পূর্ব্বপুরুষের উপাসনা—

ইহারা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে। প্রেতাত্মা উপাসনার ত্রুটি হইলে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করে। ফাল্গুন মাসের হোলী পর্ব্বে ছাগ ও কুক্কুট বলি এবং মদ্য প্রদান পূর্ব্বক প্রেতাত্মার পূজা করে। পরিবার মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে কহে যে, পীড়ার শান্তি হইলে পিতৃপুরুষের পূজা প্রদান করিবে। অযোধ্যা প্রদেশে নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের যাজন ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম—

পাহাড পন্দো (পর্ব্বতের দেবতা), ভুরাসিন বাঁহিয়া দেও, (বাঁও=বাহু) ও দেওনাথ ধরকারদিগের দেবতা। উত্তরের ধরকারগণ বির্ত্তিয়া, দুলহা দেও (বিবাহের দেবতা) ও পঞ্চ মুসলমান পীরের উপাসনা করে। এই পাঁচ জনের মধ্যে পরিহার বিশেষ আরাধ্য পীর। দুলহা দেও বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষীয় যে কোন রবিবারে পূজা প্রাপ্ত হন। দুলহা দেবের পূজাদাতাগণ স্ব স্ব গৃহে 'খাসী' বলি দিয়া আপনারাই সেই মাংসে উদর পূর্ণ করে। দুলহা দেও হরিদ্রা রঞ্জিত একখানি বস্ত্রও পাইয়া থাকেন। যখন পূজাদাতা ঐ বস্ত্র পরিধান করে, তখন দুলহা দেও তাহার উপর আবির্ভাব হন। সে অনবরত মস্তক চালনা করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে অনর্গল ভবিষ্যদ্বাণী নির্গত হইতে থাকে। যদি দুলহা দেও রীতিমত পূজা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে জ্বর ও অন্যান্য পীড়া প্রেরণ করেন।

পঞ্চপীরের পূজার উপকরণ রুটি ও মোরগ। যাহারা পঞ্চপীরের উপাসক তাহারা স্ব স্ব গৃহে পীরগণের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। অযোধ্যা প্রদেশে ছাগ বলি দিয়া দেবীর পূজা করে। দক্ষিণের ধরকারগণ উপরোক্ত দেবতাগণের পূজা দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর আগমাগমন

আলয়ে করিয়া থাকে। প্রথমে ঘৃত ও গুড় আহুতি দিয়া হোম করে তৎপরে ছাগ ও কুক্কুট বলিপ্রদান ও অবশেষে ভূমির উপর কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করিয়া থাকে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই পূজা করিতে পারে. তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বা 'বৈগা' আহুত হন বা হয় না। পিতৃপুরুষের উপাসনা হোলী ও দশহরা (বিজয়া দশমী) পর্ব্বে, এই সকল সময়ে ইহারা সুরা পানে মত্ত হয় এবং পায়ে ঘুঁগুর (ঘুঙরু) বাঁধিয়া বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য করে। এই অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আলয়ে নৃত্য করিতে গমন করে এবং পারিতোষিক (ফিরি হরি=ফেরী) প্রাপ্ত হয়। এই পুরস্কার সাধারণতঃ এক সুর্প (কুলা) পূর্ণ যে কোন প্রকার শস্য। ইহারা কহে যে অঙ্গারমতি ভবানী গ্রীষ্মকালে রথারোহণে আকাশে ভ্রমণ করেন। দারুণ রৌদ্রে হঠাৎ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কহে যে, ঐ দেবী এই রোগ প্রেরণ করিয়াছেন। সেই হেতু দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হোম করে ও ছাগ বলি দেয়। দেবতাগণের স্থান ইহাদিগের গৃহমধ্যস্থ মৃৎ-বেদিকা। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য ভূতের পূজা দিয়া থাকে। জলমগ্ন ব্যক্তির প্রেতাত্মা সমধিক ভয়ের কারণ। এই ভূত জলাশয়ে বাস করে এবং অসাবধান পথিকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ক্ষেত্রবিশেষেও ভূত থাকে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তি 'বাঘৌৎ' ভূত। বাঘৌতের জন্য বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখে এবং বাঘৌৎকে অতিশয় মান্য করিয়া থাকে। বংশও ইহাদিগের নিকট সম্মানার্হ। অগ্রহায়ণ মাসে একখানি বাঁশ কাটিয়া শুভ সূচনা করিয়া রাখে তৎপরে বাঁশ কাটা আরম্ভ হয়। প্রথম কর্ত্তিত বংশ সসম্মানে গৃহে লইয়া আসিয়া গুড় ও ঘৃত দ্বারা হোম করে, তৎপরে তাহা দ্বারা ঝুড়ি ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে।

স্ত্রীলোকগণ উল্কী পরে; উল্কীর কোনরূপ বিশেষত্ব নাই। তবে উল্কী না পরিয়া মৃত্যু হইলে ভগবান জ্বলন্ত মশাল দিয়া দেহ দগ্ধ করিয়া দেন। পীড়িত হইলে মনে করে যে, হয় ডাইনে খাইয়াছে, নতুবা ভূতে পাইয়াছে। ডাইনে খাইলে বৈগা আসিয়া ছাগ কিম্বা কুক্কুট বলি দিয়া গ্রাম্য দেবতার পূজা দেয়। ভূতে পাইলে বৈগা বা ওঝা একখানি কুলায় কিছু যব লইয়া গুণিয়া বলিয়া দেয় যে, কোন্ ভূত ক্লেশ দিতেছে। 'নজর' লাগিলে ঘুঁটের ছাই লইয়া পিতৃপুরুষের নামে পাঁচ বার ফুঁ দিয়া সেই ছাই শিশুর শরীরে মাখাইয়া দেয়। ইহাতে যদি শিশু আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে পিতৃ-পুরুষের (পুর্খালোকের) পূজা দেয়।

সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি—

রমণীগণ পায়ে পাইরি (দস্তার পাঁইজোড়), হাতে গালা বা কাঁচের চুড়ী, উপর হাতে (বাহুতে) তাগা (চুরলা) এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দস্তার আঙটী পরে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরবর্ত্তী অঙ্গুলিদ্বয়েও দস্তার আঙটা (ছোট্কী) পরে; বিধবা হইলে আঙটা খুলিয়া ফেলে। কপালে টিকুলী (টিপ) ও কাণে 'তারকী' (তালপাতার কাণের অলঙ্কার) এবং গলায় মালা (গুড়িয়া) পরে। দিব্য (শপথ) করিতে হইলে মস্তকে বাঁশ রাখে এবং মিথ্যা শপথ করিলে ধন ও পুত্রের নাশ হইবে.

বলিয়া বিশ্বাস করে।

একণে ইহারা গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে; কেহ ভক্ষণ করিলে জাতিচ্যুত হয়। অযোধ্যা প্রদেশে পিতৃপক্ষে অনেকে মাংস ভোজন করে না। চামার, ধোবী, পাতারী, ভুইয়া ও ডোম ঘৃতপক্ক (পাক্কা খানা) খাদ্য স্পর্শ করিলে ভোজন করিবে না। ইহারা ডোম অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চতর জাতি বলিয়া বিশ্বাস করে।

সিদ্ধান্ন (কাচ্চা খানা) কেবল স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ প্রস্তুত করিলে ভোজন করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ বধূ, স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং পুত্র বা কন্যার শ্বশ্রূকে স্পর্শ করে না। সুরা ও তামাক অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে, স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক ভোজন করে। পুরুষগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে রমণীগণ ভোজন করে। কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত ভোজন করিলে কোন আপত্তি নাই। বয়োজ্যেষ্ঠগণকে "পায়ে-লাগি" বলিয়া সম্মান রক্ষা করে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ "আশীষ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। ইহারা অতিশয় আতিথেয়। কোন অতিথি আসিলে গৃহে কোনরূপ সংস্থান না থাকিলে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করিয়া থাকে। ইহারা সৎব্যবহার দ্বারা রমণীগণের সম্মান করে বটে কিন্তু তাহাদিগের অপরাধের জন্য প্রহার করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। বৃদ্ধাগণের প্রতি রীতিমত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। আজি পর্য্যন্ত ধরকারদিগের মধ্যে একজনও লিখিতে বা পড়িতে পারে না। ইহাদিগের সমস্ত বিষয়ই জাতীয় পঞ্চায়ৎ মীমাংসা করিয়া দেয়, তজ্জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয় না। ইহারা কেবল বাঁশের কুলা, ঝুড়ি, ডালা, পেটারী, বিল্হারা (পান রাখিবার ছোট পেটারী) ও সিন্দুরের পেতে (পৌতি) প্রস্তুত করে। পল্লীগ্রামে ঐ সকল দ্রব্যের বিনিময়ে শস্য প্রাপ্ত হয়; নগরে বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

বঙ্গের কৃষি ও সাহিত্য কথা।

গোজনন সম্বন্ধে যাহাতে দেশের লোক বৈজ্ঞানিকরূপে শিক্ষালাভ করে, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর চেষ্টা করা উচিত। যে সকল পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহা শিক্ষা ও কৃষিবিভাগ হইতে কৃষককুলকে বিলাতের অনুকরণে ইহা বিনা ব্যয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজা বিজয় সিংহ দুধুরীয়া, মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রভৃতি দেশের অগ্রণী ভূস্বামিগণ ঐরূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া স্বীয় প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেশের মহীয়সী হিতসাধন করিতেছেন।

এখন দেখা যাউক, গো-রক্ষা ও পালন সম্বন্ধে আমাদের দেশের কোন্ কোন্ মহাত্মা বিশেষ উদ্যোগী ও চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে মিঃ জাসাওয়ালার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। মিঃ সাপুরজী জাসাওয়ালা এই গোরক্ষাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজে বহু

অর্থব্যয় করিয়া বিলাতে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার পত্রাদি ও সহায়তার আবেদনপত্র আমার স্বদেশবাসিগণ স্থানীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে দেখিয়া থাকিবেন। আমাদের দেশের লোক মিছা সেন্টিমেন্টের জন্য সহস্র-সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু মিঃ জাসাওয়ালাকে অধিক সাহায্য করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে কেহই অগ্রসর হন না, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের অধিক আক্ষেপের কথা কি হইতে পারে? লক্ষ্ণৌর আনন্দবিহারী লাল এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী, তাহার পর, হরিদ্বারের রামদাস বাবা এ বিষয়ে কম উদ্যোগী নহেন। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র বৃদ্ধ হইলেও অদম্য-উৎসাহে কৃষি-সমিতি-বিষয় দেশে দেশে প্রচার দ্বারাও বহুবিধ উপায়ে দেশীয় গোকুলের উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়া কাজ করিতেছেন। ইহার জন্য তিনি দেশের লোকের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে মনস্বী হাসানন্দ বর্ম্মা ও অমূল্যধন আঢ্যের নাম উল্লেখ না করিলে তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হাসানন্দ পিলুয়ার শ্রীকৃষ্ণ-গোশালার স্থাপয়িতা। ইনি কাঁচরাপাড়ায় গোচারণ জন্য সহস্র বিঘা জমি ঘাসের জন্য সংগ্রহ করিয়া দেশের গোকুলের রক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বিগত ২৬শে মে তারিখে ডেলীনিউস পত্রিকার সম্পাদক এক ওজস্বিনী প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের সুষুপ্ত ভারতবাসীকে জাগরূক হইয়া এই কাজে যোগদান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। অমূল্যবাবু কলিকাতা কর্পোরেশানে "ভোট" দিয়া এবং অশেষবিধ আন্দোলন করিয়া গো-রক্ষা ও দুগ্ধ সরবরাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি বঙ্গের এক বিশাল কৃষক-সম্প্রদায় সমিতি। তাঁহারাও কলিকাতা করপোরেশন বঙ্গীয় লাট দরবারে গো-রক্ষার জন্য অথবা অবাধ গো-হত্যা বিধি রহিত করিবার জন্য আন্দোলন ও আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু কাজে এখনও কিছু হয় নাই। দেশের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে চারণ ছাড়িবার জন্য বঙ্গীয় জমিদার সভা এক পাণ্ডুলিপি কৃষি-বিভাগের আদেশ ক্রমে দেশের যাবতীয় গণ্য-মান্য ভূস্বামিবর্গের মত সংগ্রহের জন্য প্রচার করিতেছেন। এটা আমার "লাড্ডু দিয়া ছেলে ভুলানর" মত বোধ হয়। চারণ সম্বন্ধে মোটা-মুটি বিধি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সবই নিজে করিতে পারেন। তিনি দেশের রাজা, হর্ত্তাকর্ত্তা, তাঁর আবার জমীদারের দোহাই দিয়া চারণ ভূমি ছাড়িবে কি না, সে সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহের জন্য যাইবার প্রয়োজন কি, তাহা বলিতে পারা যায় না। অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর জমীদারগণ এ মহৎ বিষয়ে কখনই উদারতা প্রদর্শন করিয়া অপক্ষপাতী মত দিবেন না, এই আমার বিশ্বাস!! আমাদের দেশের কৃষিবিভাগকে দেশের কৃষক ও সওদাগরগণের হিতকর করিতে হইলে বিলাতী অনুকরণে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। দেশের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায় হইতে প্রাদেশিক সভায় কৃষিপ্রতিনিধি

নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমি বহু বার বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়াছি। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-গো-রক্ষা প্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়-গুলি দেশের লোকের বিশেষ সমাহিত চিত্তে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং কিসে দেশের অভাব তিরোহিত হয়, সে সম্বন্ধে সভাগণের গবর্ণ-মেণ্টকে বলা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

গো-বীমা আমাদের দেশে শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রেরিত বিজ্ঞাপনে জানিলাম; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, কিরূপে পরিচালিত, এরূপ কোম্পানীতে আমাদের কি কি হিত সাধিত হইবে ও হই-তেছে এবং কোন্ কোন্ দেশের প্রসিদ্ধ রথিগণ ইঁহার কর্ণধার আছেন, তাঁহারাই বা কে কিরূপ লোক, তাহা না জানিলে এ সম্বন্ধে কোন মতা-মত আমরা লিখিতে পারিলাম না। আমাদের দেশের বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রভূত সাধারণ অর্থের অপচয়, চুরি ও আত্মসাৎ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত। বড় নামের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন পুনশ্চ ক্ষতিগ্রস্ত না হই, দেশের লোককে সাবধান করিবার জন্য ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। কোন অভিনব কাজে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের পাঁচবার ভাবিয়া কাজ করা দরকার।

আগামী ডিসেম্বর মাহায় গো-রক্ষাকল্পে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভা আহুত হইবে। তাহা যেন সকল কৃষক-সম্প্র-দায়কে আহ্বান করিয়া গঠিত ও আহুত হয়, এই আমাদের ইচ্ছা এবং ডিসেম্বরের বিরাট সভার পূর্ব্বে দু'একটী খণ্ড-সভা হাওড়া, লিলুয়া, ভবানীপুর, বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে আহুত হইলে খুবই ভাল হয়। এইগুলিতে কলি-কাতার গোয়ালাগণের আগমন এবং বক্তৃতা শ্রবণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের এখন সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে আমরা এই ঘোর জীবন সংগ্রামের দিনে কিসে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। এ বিষয়ে সেদিনকার ২৪পরগণা-বার্ত্তাবহ বেশ কথা বলিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক-গণের তাহা অরুচিকর হইবে না।

কালচক্রের কুটিলাবর্ত্তনে হিন্দুর কত কীর্ত্তি-কলাপ যে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিতে বসি-য়াছে, কে তাহার গণনা করে? হিন্দুর জ্ঞান-গৌরব, সাম্রাজ্যবৈভব, ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য, সমাজ-সভ্যতা সকলই প্রায় অন্তর্হিত হইতে চলি-য়াছে! হিন্দুর অনন্ত প্রাচীন গৌরবের মধ্যে আজ বিদ্যমান আছে কি? আজ আছে বলিতে হিন্দুর মাত্র দুইটী বস্তু বিদ্যমান,—এক ধর্ম্ম, আর আয়ুর্ব্বেদ। হিন্দুর অগণিত গৌর-বের সামগ্রী লোপ পাইয়াছে। পশ্চিমাকাশে ধুমকেতু উদিত হইয়া হিন্দুর বহু কীর্ত্তিকলাপ অকালে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। কেবলমাত্র দুইটী বস্তর বিলোপ সাধিত হয় নাই;—উহা আমাদের ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাতমধুর ধাঁধায়

সমাকৃষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া আমরা তখন নিজেদের যাহা কিছু ভাল—যাহা কিছু স্থায়ী—যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহারই উপর একটা মহা বিতৃষ্ণভাব পোষণ করিতে শিখিয়াছিলাম। তাহারই ফলে, এ দেশের কত সুখের, ও সাধনার বস্তু যে আমাদের সমাজে সম্মান না পাইয়া বনে, জঙ্গলে বা পর্ব্বতের নিভৃত গহ্বরে ঠাঁই লইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম আকর্ষণে হিন্দু যেন সহসা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিল! সেই নব জাগরণের অবস্থায় হিন্দুর চক্ষে ঘরের ঠাকুর বিদেশের কুকুরাপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল না। ঘরের কাঞ্চন অপেক্ষা বিদেশের কাচ যেন অধিকতর প্রভা-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইল। তখন দেশের ভাষা, ভাব, শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান যাহা কিছু সমস্তই যেন বিদেশের তুলনায় একান্ত বিসদৃশ বলিয়া হিন্দুর চক্ষে অনুভূত হইল। দেশের যাহা কিছু উচ্চ, হিন্দুর চক্ষে তাহাই যেন নীচ হইয়া পড়িল। এইরূপে হিন্দুর বহু গৌরব-সামগ্রী লোপ পাইল। তখন এ দেশের সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাশ্চাত্য মেটেরিয়া-মেডিকার আবির্ভাবে হিন্দুর গৃহ-কোণে ঠাঁই পাইল। ধন্বন্তরিকল্প আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মহীপণ্ডিত কবিরাজেরা তখন পাশ্চাত্যশিক্ষাসম্পন্ন নব্য ডাক্তারদিগের আদব-কায়দা, হাবভাব, চাল-চলন এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া সভয়ে দূরে সরিয়া পড়িলেন।

এখন আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলা আবশ্যক। কারণ তাহা না বলিলে যেন অনেক কথা বাকি থাকিয়া যায়।

এখন সাহিত্য বলিতে আর সহিত-ভাব বা সাহচর্য্য বুঝায় না, সাহিত্যের সুমহান ক্ষেত্র এক্ষণে মেছোহাটায় পরিণত হইয়াছে! যিনি বেশী কলহ করিতে পটু, যাহার চাপরাস বা সুপারিসের জোর আছে, যাঁহার আন্তরিকতার অপেক্ষা বাচালতা অধিক, সাহিত্যের বাজারে তাঁহারই প্রসার প্রতিপত্তি ও জয়জয়কার অধিক। আমাদিগের অভিধান সাহিত্য কথাটিকে যে ভাবে ধরিয়াছে, তাহার ত আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। আমরা কেবল এতদিন ধরিয়া প্রকৃত সাহচর্য্যের পরিবর্ত্তে, সাহিত্য কেবল আগাছায় ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিয়া আসিতেছি। অসৎ-সাহিত্যের আদরই দিন দিন বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা কি এই হতভাগ্য দেশের সাহিত্যিক ও সামাজিক ধুরন্ধরগণ দেখিতে পাইতেছেন না? এই অসৎ সাহিত্যরাশির দমনের কি কোন উপায় নাই? সাহিত্য কি ছেলেখেলার জিনিষ? জাতীয় সাহিত্যই যে জাতীয় চরিত্র গঠন করে, ইহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? আমরা যে কিরূপ অধঃপতনের পথে যাইতেছি, তাহা কি আমরা কখনও নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখি? বর্ত্তমানে আমরা প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই কেবল আগাছার বীজ রোপিত করিয়া যাইতেছি। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং দশের মুখ চাহিয়া আমাদিগের ভিতর কয়জন সাহিত্যিক লেখনী পরিচালনা করিতেছেন?

সাহিত্য বলিতে আমরা এখন যেন বুঝি কতকগুলি ক্ষুদ্র গল্প, গীতি-কবিতা ও গীতি-নাট্যই একমাত্র সাহিত্যের উপাদান। কি ভ্রান্ত আমরা! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি বর্ত্তমান যুগে গল্পস্রোত, গীতি-কবিতা ও গীতি-নাট্যগুলি সমাজ এবং সাহিত্যের অধিকতর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই তিনটা সামগ্রীতে না আছে আদর্শ, না আছে সৎ উদ্দেশ্য।

রঙ্গলাল, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সাহিত্যিকগণ একটা মহতী কল্পনা লইয়া তদানীন্তন সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন, ক্ষুদ্রত্ব তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই সেই মহানুভব প্রতিভার বরপুত্রগণ যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উচ্চ ও উদার, স্ব স্ব কল্পনায় তাহাই বিবৃত করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত সাহচর্য্যের ভাব লইয়া তাঁহারাই একমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যে সে সহযোগিতার ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে। একতা কি বাঙ্গালী জীবনের আদৌ স্বধর্ম্ম নহে? তজ্জন্যই বুঝি আমাদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। আমরা একতার মালা গাঁথিতে জানি না, পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারি না। ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী হইয়া থাকিবার যে কত সুখ, তাহা আমরা বর্ত্তমানে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই সহজ উপায়টা যতদিন না আবার আমরা অবলম্বন করিতেছি, ততদিন আমরা নোবেল প্রাইজই আনি বা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারেই স্থান পাই, আমাদিগকে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে।

বর্ত্তমান আন্তরিকতার যুগে মৌখিকতার অভিনয় টিকিবে না। এক সময়ে হিন্দু-সমাজকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ মদিরা ও ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে রক্ষা করিতে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, দেশকে ভোগের কবল হইতে রক্ষা করিতে ত্যাগের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল—ত্যাগের মন্ত্র লইয়া, কৌপীন পরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আবার বৈষ্ণব হইলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের মৌখিক গতি প্রতিরোধ কল্পে এখনও হিন্দুধর্ম্মের সশস্ত্র প্রহরীস্বরূপ রামকৃষ্ণ মিশন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী নির্ভয়ে দণ্ডায়মান। তেমনি বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতিভা কি কখনও রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ বা কাঞ্চন কৌলীন্য নিষ্প্রভ করিতে সমর্থ হইবে? কখনও নহে। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগের কণ্ঠে আছেন, হৃদয়ে নাই, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী আমাদিগের আলমারীতেই সাজান আছে, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গ বঙ্গ শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ—দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটীরে এখনও প্রবেশ লাভ করেন নাই। অশ্লীল হইলেও বরং দাশু রায়ের পাঁচালী এখনও দরিদ্রের তেমনি আদরের ধন হইয়া রহিয়াছে, ভারতচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবিরাও তেমনি প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

ইহার কারণ কি ?—ইহার কারণ একমাত্র তাঁহাদিগের অনাড়ম্বর আন্তরিকতা। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ একই বিষয় লইয়া হৃদয়ে কতই না অনুরাগ ফুটাইয়া গিয়াছেন! বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী যতবার পড়ি, ততই রসাল বলিয়া বোধ হয়, ততই পড়িবার সাধ বাড়িয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের পাতা উল্টাইতে পর্য্যন্ত বিরক্তি ধরে, একবার পড়িলেই ক্লান্তি বোধ হয়। হৃদয়হীন সাহিত্য পাঠকের হৃদয়কে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র গল্প ও গীতিনাট্য অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীর কর-কমলেই শোভা পায়, যথার্থ সাহিত্যানুরাগী পাঠক বা নাট্যানুরাগী দর্শকের মন তাহাতে ভুলে না।

বঙ্গে সৎ-সাহিত্যের অনুশীলন ও প্রচার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজকে মহাধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে বর্ত্তমান নাটক নভেলের গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রেম-চর্চ্চা ত অনেক হইয়াছে, এইবার বঙ্গের সাহিত্যিকগণ কর্ত্তব্যচর্চ্চায় ব্রতী হউন, লেখনী ধরিবার অগ্রে দেশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, ছাই ভস্ম লিখিয়া আর দেশের সর্ব্বনাশ করিবেন না। দেশের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীর অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করা আর যুক্তিযুক্ত নহে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বৃথা আগাছা বসাইয়া ভবিষ্যতের পথ ও উন্নতির আশা ভরসা সমূলে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সাহিত্যিক-গণের কর্ত্তব্যের কি সীমা আছে? সাহিত্যিক হইবার দায়িত্ব ও গুরুত্ব কি আমরা সত্যসত্যই অনুভব করি? তাহা হইলে সাহিত্যে আজ ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে কেন? এমন উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন দলাদলিই বা বৃদ্ধি পাইবে কেন? ভাব দেখি, একবার পূর্ব্ব পথ-প্রদর্শকগণের পদাঙ্ক-রাশি। তাঁহারা পাঁচফুলের সাজির ন্যায় বঙ্গের সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়াছিলেন। সে যেন একটা মহা যুগ চলিয়া গিয়াছে। মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের জীবন যেন মালা গাঁথিয়া, কাঁধ মিলাইয়া একই কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মনে এবং জীবনে কোনরূপ কলহ বা পরচর্চ্চা ছিল না। সকলেই আপন আপন স্বাধীন ক্ষেত্রে তন্ময়—সকলেই সকলের উৎসাহদাতা। কি অপূর্ব্ব মিলন একদিন এই বঙ্গবাণীর পূত মন্দিরের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহা এখন ভাবিলেও সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের দলাদলি দেখিয়া আমাদিগকে বাস্তবিকই লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। কবে আমরা আবার সেই বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাগণের পদাঙ্কানু-সরণে প্রবৃত্ত হইব, কবে আমাদিগের মন হইতে যাহা কিছু নীচতা, আড়ম্বর-প্রিয়তা সমূলে উৎ-পাটিত হইয়া আমাদিগকে মহতী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিবে?

এখন মাসিক পত্রের অভাব নাই, কিন্তু কয়টা সুলিখিত গবেষণা পূর্ণ সৎ-প্রবন্ধ তাহাতে আলোচিত হয়? কেবলই ত বৈদেশিক প্রাণ হীন শ্রুতি-কঠোর বিরক্তিকর গল্প, সবই ত কলুষিত নীতি ও ভাবহীন কবিতারই ঝঙ্কার! আজকালকার কয়টা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কয়টা

প্রকৃত কথা মাসিক পত্রিকা সমূহে আলোচিত হয়? কেবল কাগজের বাহার, ছবির বাহার, কর্কশ কবিতারই বিভীষিকা দেখিতে পাই। কেবল বৈদেশিক অনুকরণে ও উচ্ছিষ্টেই বঙ্গ-বাণীর পবিত্র পীঠভূমি ভরিয়া উঠিতেছে। ধিক আমাদিগকে! এমন ভাবের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সিংহের সন্তান হইয়াও আজ আমাদিগকে ভীরু ফেরুপালের ন্যায় বৈদেশিক বায়সগণের চঞ্চু-পরিত্যক্ত মাংসখণ্ডের দিকে লোলুপ নেত্রে তাকাইতে হইতেছে। এমন জঘন্য প্রবৃত্তি ও পরমুখাপেক্ষিতা আর কি হইতে পারে? এই সব তৃতীয় শ্রেণীর গল্পানুবাদে বৃথা কালক্ষয় অপেক্ষা পাশ্চাত্য মনীষিগণের দর্শন ও বিজ্ঞান-সাহিত্যের অনুবাদের কেন যে আমরা অধিকতর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না—ইহাই আশ্চর্য্য! কেবল ইংরাজী নহে ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ প্রভৃতি সৎসাহিত্য হইতেও অনুবাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বৃথা গল্পে ও প্রেমের কবিতায় আর বহুমূল্য সময় অপব্যয় না করিয়া সাহিত্যে কর্ত্তব্য-বোধ ও দেশাত্মবোধকে প্রথম এবং প্রধান স্থান দিতে হইবে। যতদিন না বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিতেছে, ততদিন বাঙ্গালীর উত্থান সুদূরপরাহত।

আমাদের দেশের উদ্দেশ্যহীন, অপ্রয়োজনীয় সাহিত্য দেশকে প্লাবিত করিয়া দেশের লোকের রুচির বিকার ঘটাইয়া অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে ও করিতেছে। এ সম্বন্ধে মদ্বন্ধু অকিঞ্চন বাবু সেদিন চৌব্বিশ-পরগণা পত্রিকায় বেশ ২।৪ কথা বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে হইতে ২।১ কথা নিম্নে পাঠকগণের অবগতি ও চিন্তার জন্য উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না।

সাহিত্যের সাধনা বাণীর বর পুত্রগণের জীবনের একটা মহামেলা বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল, জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বাণীর সাধকগণ কত বাধা বিঘ্ন প্রতিকুলতার মধ্য দিয়া সাহিত্যের মহতী সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সাহিত্য-সাধনা দেখিয়া সে বিশ্বাস আমাদের তিরোহিত হইতে বসিয়াছে।

আজ বলিতে পারিব না বাঙ্গালীর ভিতর কয়জন সাহিত্যিক সাহিত্যের জন্য জীবন পাত করিতে ব্রতী রহিয়াছেন। সাহিত্য কথাটীকে আমরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে এতই দেখিতে শিখিয়াছি যে আমরা মনে করিতেছি যে কতকগুলি গীতি কবিতা ও গল্প লইয়াই সাহিত্যের যথাসর্ব্বস্ব, সাহিত্য যে একটা মহামেলা তাহা আমাদের জীবনে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি না। তাই কেবল ছড়া কাটিয়া গল্প করিয়া ছেলে খেলায় অমূল্য মানব জীবন অতিবাহিত করিতেছি।

এতদিন ধরিয়া আমরা যে সাহিত্য সাধনা করিয়া আসিতেছি তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের আলস্যের পরিচয়ই দিয়াছে, প্রকৃত কর্ম্মের পরিচয় দেয় নাই। কর্ম্মের অনুকল্পে দেশের এবং দশের হিতে আমরা কয়খানা সাহিত্য গ্রন্থ বঙ্গ বাণীর চরণ কমলে অর্পণ

করিতে পারিয়াছি? কয়খানা ইতিহাস বিজ্ঞান এবং দর্শন মূলক গবেষণাময় গ্রন্থে বাঙ্গলার সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি? আমাদিগের ভিতর প্রকৃত ঐতিহাসিক বিজ্ঞানবিদ এবং দার্শনিক কয়জন? অনেকে বলিতে পারেন এ সব গ্রন্থ পড়ে কয়জন? কিন্তু তাহারা কি বুঝেন না পাঠক সৃষ্টি করাও লেখকের কাজ। আজ পাঠক সমাজ যে এরূপ বিকৃত হইয়াছে তাহার জন্য আমাদের লেখক-সমাজই দায়ী। তাহারা কেবল গল্প ও গীতি-কবিতা লইয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইতেছেন, পাঠকগণ অবাধে সে সব গলাধঃকরণ করিতেছে, তদ্দারা স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবনকে কলুষিত করিয়াছে।

এরূপ সাহিত্যের মালমশলার দ্বারা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। চরিত্র কখনও গঠিত হয় না। সাহিত্য যে একটা জাতির পরিচয়, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা যে একটা প্রাণহীন মুখ সর্ব্বস্ব গল্পবাগীশ জাতি তাহা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই সহজে বুঝা যায়। কল্পনা-জগৎ লইয়াই আমাদের সাহিত্যলীলা, মিথ্যা এবং মরীচিকার পশ্চাতেই আমাদের জীবনের ছুটাছুটী, লঘুতা এবং আলস্য লইয়াই আমাদের দিন পাত। তাই আমরা গল্প ভালবাসি; কিন্তু ইতিহাস ভালবাসি না, কারণ তাহা যে সত্য! তাই আমরা ইতিহাসকে বঞ্চিত করিয়া অভিনব আকারে দেখিতে চাই, প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের আদৌ চেষ্টা নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী একটা প্রকৃত ইতিহাস খাড়া করিতে পারিল না, কেবল গল্প করিয়াই দিন কাটাইবে।

এইরূপ মিথ্যা সাহিত্য-সাধনায় ও সম্মিলনে এ জাতির মঙ্গল নাই। বৎসর, বৎসর এই যে সম্মিলন আমরা সাহিত্যের অণুকল্পে করিতেছি—ইহা দিন দিন বঙ্গরসের ন্যায় রঙ্গরসে পরিণত হইতেছে. ইহাতে প্রাণ নাই, সহানুভূতি নাই আছে কেবল উদর এবং সুখ! ইহা সাহিত্য সম্মিলন নহে, সাহিত্য সংমিলন কতকগুলি সংসাজার একত্র সমাবেশে কেবল ভূরিভোজন চলিয়াছে। প্রকৃত কাজ কিছুই হইতেছে না। তদপেক্ষা পূজনীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় যে সাহিত্য সংরক্ষণ-নীতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং মাননীয় বর্দ্ধমানপতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা সুখী হইব।

সাহিত্যের জন্য এখনও যাঁহারা প্রাণ-পাত করিতেছেন এবং সাহিত্যকে ছেলেখেলা না ভাবিয়া জীবনের মহামেলা করিয়াছেন, তাঁহাদের যাহাতে উদর জ্বালা নিবারিত করিয়া চিন্তার পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করা দেশের এবং সাহিত্যের কল্যাণকামীগণের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। প্রকৃত সাহিত্য সেবীর মধ্যে দুঃস্থের সংখ্যাই অধিক, ইহা কেবল আমাদের দেশেই নয়, সকল দেশেই সাহিত্যিকের জীবন বড়ই শোচনীয়। এমত অবস্থায়, বিশেষতঃ আমাদিগের হতভাগ্য সাহিত্যিকগণকে ধনী ও সুধীজনের সমবেত চেষ্টায় রক্ষা করিতে না পারিলে, প্রকৃত সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত হইবে না, ইতিহাস দর্শন এবং বিজ্ঞান মূলক সাহিত্য

কখনই প্রসার লাভ করিবে না এবং তদুপরিবর্ত্তে কেবল ছড়ায় এবং গল্পে দেশটা আরও অধঃপাতে যাইবে। বর্ত্তমান সাহিত্য কেবল সমাজদেহে বিলাস এবং আলস্য বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহা হইতে যত আরাজকতা এবং অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগকে আমরা উদাসীন থাকিতে বলি না। কারণ আমার মনে হয়, এই সব অলসতার পরিচায়ক গীতি কবিতাই যত অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব অসৎ-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সৎচিন্তা প্রবৃত্তিকে একেবারে বিকৃত করিয়া দিয়াছে এবং আমাদিগকে বেজায় অলস এবং বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। যাহাতে এই সব আলস্য এবং বিলাসিতার প্রশ্রয়দায়ক লঘুসাহিত্য আমাদিগের অপরিণত বয়স্ক যুবক ও যুবতীর মস্তিস্ক আর না বিকৃত করিতে পারে, এতদবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেশের বর্ত্তমান চিন্তাস্রোত ফিরাইতে পারিলে রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল। দেশে অসন্তোষের বীজ আজ সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দেশব্যাপী অসন্তোষের জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকেই অধিকতর দোষী বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার বিষে আজ আমরা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, এই শিক্ষায় একদিকে আমাদের জীবন যাত্রা যেমন উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে তেমনি হু হু করিয়া আমাদের জীবনে বিলাস অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অসন্তোষ ছাড়া ইহার পরিণাম আর কি হইতে পারে? তাই চারিধারে আজ অসন্তোষ অরাজকতারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন বটে কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে হয়—কোন *সুফল ফলিবে না, জগতে পুলিসের দ্বারা কোন* দিন এইরূপ অরাজকতার নিবৃত্তি ঘটে নাই। আমাদিগের শিক্ষায় যাহাতে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করে, আজ মনে হয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র সৎসাহিত্য এবং সৎশিক্ষাই এইসব অসন্তোষ, অরাজকতা ও অশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ। মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া শাখায় কুঠারাঘাত করিলে বর্ত্তমান অশান্তি হইতে রাজা প্রজা কাহারও মুক্তি এবং মঙ্গল নাই। এক কথায়, যতদিন না দেশের অভিভাবকগণ এই বাঙ্গালী জাতিটাকে সুখে জীবন যাপন এবং সৎচিন্তা করিতে অবসর দিতেছেন, ততদিন এইসব উপদ্রব ও আশান্তি হইতে দেশবাসী কথনই রক্ষা পাইবেনা। এইসব অরাজকতার ফল শান্তিপ্রিয় প্রজাকেই অধিকতর ভোগ করিতে হইতেছে। আজ রাজা প্রজা একত্র হইয়া দেশের কথা না ভাবিলে কেবল পুলিসের চেষ্টায় এ অশান্তির পর্য্যাবসান ঘটিবে না। সে অশান্তির মূল বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও অসার সাহিত্যসাধনা। সৎসাহিত্য এবং সৎশিক্ষার বীজ যাহাতে বাঙ্গালীর হৃদয়কে সৎপথে চালিত করিতে পারে, আজ রাজা প্রজা উভয়কেই সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং আইন করিয়া যাহাতে ডিটেকটিভ উপন্যাস, অপাঠ্য

কবিতা প্রভৃতির প্রসার আর বৃদ্ধি না পায়,তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাগ্রে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

দিল্লীর বাঙ্গালী।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র মল্লিক মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে দিল্লী সম্বন্ধে দুই একটি ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় বলিতে চান যে, বঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চার একটা আবহাওয়া তিনি এবং তৎসদৃশ কতিপয় ব্যক্তি দিল্লীতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র লাল মিত্রের নামের পরিবর্ত্তে তাঁহাদেরই নাম উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত হউক।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু যদি এই কথায় আস্থা স্থাপন করেন ত দিল্লীর বাঙ্গালী সাধারণের উপর তিনি অবিচার করিবেন। এখানে বঙ্গ-সাহিত্যসভা নামক যে একটি পুস্তকালয় আছে, তাহা কোনও কালে সাহিত্য সভা নহে। তথায় এমন এতটুকু স্থান নাই যে, সেখানে বাঙ্গালী গিয়া সাহিত্যালোচনা করে। ঐ পুস্তকালয়ের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজের বাটীর একটি ক্ষুদ্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাই এখনও উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। নচেৎ উহার এমন অর্থ নাই যে,একটি ঘর ভাড়া করিয়া সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের মৃত্যু উপলক্ষে এখানে শোকসভা আহূত হইয়া ছিল, তাহা দিল্লীস্থ বাঙ্গালীগণের সমবেত চেষ্টায়,বঙ্গ-সাহিত্যসভার তাহাতে বিশেষ কোনও কৃতিত্ব ছিল না। উক্ত সভার সাধারণ অধিবেশনে কোনও কালে বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পাঠ হইত না; তবে স্থানীয় হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এক সময় অত্রত্য বাঙ্গালা স্কুলে গুটিকতক বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। নির্ম্মলবাবু বলিয়াছেন— উপযুক্ত লোকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বাঙ্গালীদিগের হৃদয়ে প্রীতি ও সদ্ভাব সঞ্চার করিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা চিরদিনই যত্নশীল রহিয়াছে। আমারা কিন্তু এ যত্নশীলতার পরিচয় কোনও কালে পাই নাই এবং ইহাও জানি যে এতাবৎ কাল কোনও উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা প্রবন্ধ দিল্লীতে পঠিত হয় নাই।

গতবৎসর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানকার বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা স্কুলে এক সভা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে সভায় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার ত নামোল্লেখ পর্য্যন্তও হয় নাই। যদি বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এখানকার সাহিত্যচর্চ্চার কেন্দ্র-স্থলই হইবে, তবে সে সময় ইহা কি জন্য চুপ করিয়া ছিল?

এখন দিল্লীর বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ১০০ ঘর। কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের পাঠকের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে ৩০ জনের অধিক পাঠক কখনও হয় নাই, তবে

শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার পর হইতে অনেক অপব্যয় নিবারিত হয় এবং পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহারই ফলে জনকতক পুস্তক পাঠকের সংখ্যা বারিয়াছে। এই পুস্তকালয়ের অতীতের ইতিহাস বড় ভাল নহে, তবে হীরালালবাবু ও জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সভ্যগণের যত্নে যে ভবিষ্যতে ইহার প্রভুত উন্নতিসাধন হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের চেষ্টায় এখানে যে বান্ধব-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিক্রিয়া বশতঃ বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যাত্রা, থিয়েটর ও ঐক্যতানবাদন সমিতিতে পরিণত হইয়া ইহা সাধারণের চিত্তবিনোদন করিতেছে। সেই বান্ধব-সমিতির সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় এখন বাদ্যযন্ত্র শিক্ষক। রাজ-পুরুষদিগের অভ্যর্থনা, বিদায় প্রভৃতি নানাবিধ উৎসবের সময় এই একতান বাদন সম্প্রদায় কেবল বাঙ্গালীদিগের নহে, সমস্ত দিল্লীবাসী-দিগকে আনন্দ দান করিতেছে। Revd. andrews পাদরী সাহেব লক্ষৌতে বক্তৃতা করিবার সময় এই একতান সমিতি ও থিয়েটারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই বান্ধব-সমিতির জন্ত সমগ্র দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালী, স্থানীয় মুসলমান, সাহেব, হিন্দুস্থানী প্রভৃতির নিকট আদর-যত্ন-সম্মান পাইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার প্রভৃতি যুবকগণের যত্নে থিয়েটারের দল অভিনয় দ্বারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই উপার্জ্জিত অর্থ সমস্ত War fund যুদ্ধ-তহবিলে দান করিয়াছিলেন। অত্রত্য Chief commissioner মাননীয় হেলী সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী স্বহস্তে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদিগকে রৌপ্য পদক পুরস্কার দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যে পত্র পূর্ব্বে প্রবাসীতে সারদাবাবুর পত্রের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, সে পত্র বা তিনি উভয়েই কাল্পনিক নহেন। নির্ম্মলবাবু যে পুস্তকালয়ের সহঃ-সম্পাদক, জিতেন্দ্রবাবুও সেই পুস্তকালয়ের অন্যতম সভ্য। দুই জনেই এক আফিসে কর্ম্ম করেন। জিতেন্দ্রবাবু উচ্চপদস্থ ও নির্ম্মলবাবু নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। প্রত্যহই দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে এ কাল্পনিক কথার অর্থ কি? বিষয়টী যে কল্পিত নহে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বান্ধব-সমিতি যে সময় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্গীতচর্চ্চা, সাহিত্যচর্চ্চা, ব্যায়ামচর্চ্চা প্রভৃতি সমস্তই হইত। সঙ্গীতচর্চ্চা হ্যামিল্টন রোডে হালামের উপরকার বাসায় হইত এবং ঐ বাসায় নেহাল রমইয়ার ঘরে সাহিত্যচর্চ্চা হইত। ব্যায়ামচর্চ্চা কল্যাণ সিংহের গলিতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে হইত। বান্ধব-সমিতির সাহিত্যশাখাই পরে বাঙ্গালা লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। নির্ম্মল বাবু কিংবা তৎসদৃশ ব্যক্তিগণ অবশ্য ব্যায়াম শাখায় কখনও যাইতেন না, কিন্তু তাই বলিয়া যে সে শাখা ছিলনা এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তিনি যে সমস্ত ভদ্রলোকের

নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঐ বান্ধব-সমিতির সঙ্গীত চর্চ্চায় যোগ দিতেন। তিনি এই সমিতিকে ব্যষ্টি ভাবে না দেখিয়া সমষ্টি ভাবে দেখিলেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

দিল্লীতে বাঙ্গালীগণের মধ্যে একতা, প্রীতি, সদ্ভাব প্রভৃতি স্থাপন করিবার জন্য যদি কেহ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়া থাকেন ত তাঁহারা ৺হেমচন্দ্র সেন ৺আশুতোষ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্র। প্রথম দুইজন মহাত্মা বহু দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং যতীনবাবুও প্রায় ১২ বৎসর হইল এখান হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতি সমগ্র দিল্লী প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজও জাগরূক আছে। আশা করি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির নামের পরিবর্ত্তে কতিপয় নগণ্য ব্যক্তির নামের দ্বারা তাঁহার পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবেন না। আমাদের অনুরোধ, নির্ম্মলবাবু দিল্লীতে বাস করিয়া বান্ধব-সমিতির নিরাকারত্ব আর কখনও উপলব্ধি করিবেন না ও প্রবাসীতে অযথা যা তা কতকগুলা লিখিয়া সত্যের অপলাপ করিবেন না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেঙ্গল আম্বুল্যান্সকোরের প্রতি।

নীল সাগরের অপর পারে
কোথায় কেবা যুদ্ধে মরে।
এতদূরে থেকেও তোদের
তাদের তরে পরাণ পোড়ে।
মহৎ প্রাণের মহৎ বিবেক
তোরা নাহি ঠেল্‌তে পারিস্।
(তাই) বীরের মত দলে দলে
সমরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়িস্।
আহতদের সেবা-ব্রত
তার বাড়া যে পুণ্য নাই।
জননীর ক্রোড় ছাড়ি
সুদূর দেশে গেছিস্ তাই।
বাংলা-মা'র কৃতী ছেলে
তোরাই যে ভাই জন্মেছিস্।
স্বরগ থেকে মা জননী
ঢালুক মাথে স্নেহাশীষ।

শ্রীমনীষীমোহন রায়।